নেহেরু বাল পুস্তকালয়

যেসব আবিষ্কারে দুনিয়া পালটে গেছে

প্রথম খণ্ড

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

নেহেরু বাল পুস্তকালয়—22

যে-সব আবিষ্কারে দুনিয়া পালটে গেছে

(প্রথম খণ্ড)

মীর নাজাবাত আলি

অনুবাদ

শ্রীমতী রমা বাই দে

ছবি

আহমদ

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

নয়া দিল্লি

চাকা
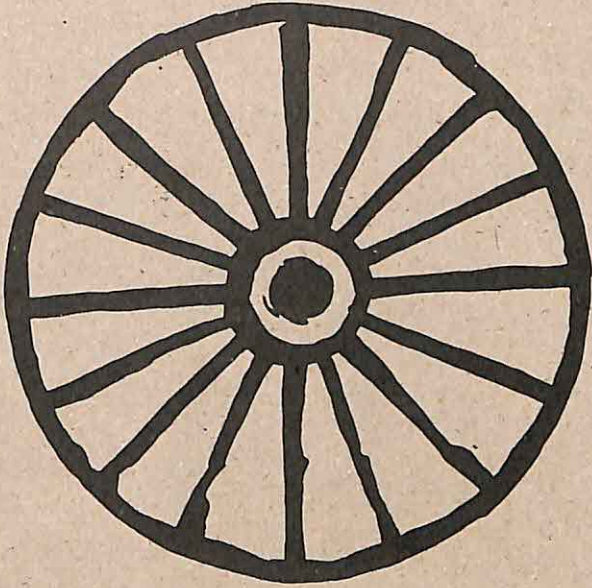
চাকাই বোধহয় মানুষের সব থেকে বড় আবিষ্কার। মনে হয় যেন খুব সোজা, কিন্তু, সবরকম গতির মূলে রয়েছে এই চাকা। গরুরগাড়ী, সাইকেল, মোটরগাড়ী ও রেলগাড়ী, সবই চলে চাকার ওপর। এমনকি যে উড়োজাহাজ আকাশে হাজার কিলোমিটার উঁচুতে যায়, তাও এই চাকা দিয়েই মাটি ছেড়ে ওড়ে ও আবার ফিরে আসে। শুধু যে যানবাহনের জন্য চাকার নিতান্ত প্রয়োজন তা নয়। যে যন্ত্র আমাদের নানা জিনিষ তৈরী করে, যে

ঘড়ি আমাদের সময় বলে দেয়, যে উৎপাদন যন্ত্রে (generator) বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয় ও আরো নানাধরণের কল, যা আজ প্রতিদিনের জীবনে অত্যন্ত জরুরী, এই চাকা ছাড়া সবই অচল।

এ সব ভাবলে হয়তো মনে হবে যিনি এই চাকার আবিষ্কারক, তিনি নিশ্চয়ই বিপুল ধন, যশ ও প্রতিপত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। এই লোক যে কে, আসলে কিন্তু তা কখনোই জানা যায় নি। তোমরা একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে চাকাওয়ালা গাড়ী ছাড়া মানুষের পক্ষে ঘোরাফেরা বা ভারী মালপত্র সরানো কি দুরূহ ব্যাপার ছিল। আজ থেকে মাত্র 5000 বছর (প্রায় 3000 খৃঃ পূঃ) আগে কোনো এক বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই সরল উপায়টি আবিষ্কার করেন। আজ তা পৃথিবী জুড়ে মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান যন্ত্র হয়ে উঠেছে।

চাকা চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে মালবাহী পশুকে দিয়ে বোঝা বওয়ানো বন্ধ হল তা কিন্তু নয়। এখনো এশিয়ার ও আফ্রিকার কোনো কোনো দেশে শুধু পশুই নয়, মানুষও ভারী বোঝা ও যাত্রীদের বহন করে নিয়ে যায়। এমনকি যে সব দেশ যন্ত্র ব্যবহারে বেশ উন্নত, তারাও যে সব জায়গায় চাকাওয়ালা যন্ত্র নিয়ে যেতে পারে তাও নয়। সেখানে তারা মানুষ ও পশুকে কাজে লাগায় ; যেমন, বরফে ঢাকা পাহাড়ে বা গভীর ঘন জঙ্গলে।

চাকা তৈরী হওয়ার আগে মানুষের পক্ষে দূরের জায়গায় যাওয়া নিশ্চয় খুব কষ্টকর ছিল। যাত্রীরা নিজেদের বোঝা নিজেরা বয়ে অজানা রাস্তায় নানাধরনের বিপদে পড়ত। তখনকার দিনে পথের মাঝে কোনো ধর্মশালা বা সরাইখানা ছিল না, যেখানে বসে, খেয়ে, বিশ্রাম নিতে পারা যায়। তাই খুব অল্প লোকই সাহস করে ভ্রমণে বেরোত। এমনকি যারা বেরিয়ে পড়ত, তারাও জানত না কখন গন্তব্যস্থানে পৌঁছবে এবং কখনই-বা নিরাপদে বাড়ী ফিরবে।

চাকা এল কি করে ? চল, আমরা মানুষের প্রথমদিকের ইতিহাস খুলে দেখি। মানুষ প্রথমে নিজের ব্যবহারের জন্য অন্য প্রাণীদের পুষতে শুরু করে। পশুদের মধ্যে কুকুরই প্রথম পোষ মানে। সে পাহারা দিত এবং কোনো আসন্ন বিপদের আগে প্রভুকে সতর্ক করে দিত। শিকারের কাজেও কুকুরকে ব্যবহার করা হ'ত।

ক্রমে মানুষ বুঝতে পারল যে একদল কুকুর ভারী বোঝা বেশ কিছুটা টেনে নিয়ে যেতে পারে। তখন সে কতকগুলো কাঠ জোড়া দিয়ে একটা তক্তা বানিয়ে তার ওপর মালপত্র চাপিয়ে কুকুর দিয়ে টানাল। এই গাড়ীর নাম স্লেজ (sledge)। কখনও-বা তারা নিজেরাও যেতে আসতে এই গাড়ীতে বসে পড়ত। উত্তর ইওরোপে, চাকা চালু হওয়ার বহু আগে

গাছের বাকল, পশুর চামড়া ও খাঁজকাটা গাছের গুড়ি দিয়ে তৈরী হ'ত স্লেজ। মিশর ও সিরিয়ায় রথ ও ওয়াগনের চাকা চালু হওয়ার পরেও স্লেজগাড়ীতেই বড় বড় পাথর টেনে নিয়ে যাওয়া হ'ত।

কুকুর ছাড়াও অন্যান্য পশুকে পোষা ও কাজ সেখান শুরু হল। হয় চড়তে, না হয় বইতে পশুগুলিকে ব্যবহার করা হ'ত। গাধা, খচ্চর, ঘোড়া, উট, হাতি, ষাঁড় ও অন্যান্য বহু পশুদের এইভাবে কাজে লাগানো হ'ত। এতে ব্যবসায়ী ও তীর্থযাত্রীরা ঘন ঘন নানাদিকে ঘুরতে বেরিয়ে পড়ত এবং পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করার অনেক বেশী সুযোগ পেত, যদিও তাতে পথের বিপদআপদ ও কষ্ট ছিল।

আমরা আগেই বলেছি স্লেজই মানুষের প্রথম গাড়ী। এই গাড়ীতে গড়ানো চাকা লাগিয়ে, মানুষ পরিবহনের ইতিহাসে আর এক ধাপ এগিয়ে গেল। ঘষে চলার থেকে গড়িয়ে চলা অনেক সহজ, কারণ এতে সজ্ঘর্ষণ অনেক কমে যায়।

সবসময় মানুষ তার মালপত্র নিয়ে কি করে আরামে, নিরাপদে ও তাড়াতাড়ি দূর-দূরান্তে যেতে পারে তার একটা উপায় বহুদিন ধরে খুঁজছিল। সম্ভবত সে আবিষ্কার করেছিল যে স্লেজের তলায় কয়েকটা গোল গোল কাঠের টুকরো পেতে দিলে স্লেজ সহজেই চলবে। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে আজকের দিনেও সেই একইভাবে অফিসে বা কারখানায় ভারী মালপত্র সরানো হয়। ভারী বোঝা একটি বা দুটি গোল নলের (pipe) ওপর চড়িয়ে তাকে গড়িয়ে দেওয়া হয়। ওই ভার গড়িয়ে গেলে নলগুলি তুলে আবার সেই বোঝার নীচে রাখা হয়। এইভাবে সমস্ত মালপত্র সরানো হয়। চাকার ব্যবহার প্রচলিত হওয়ার অনেক আগে আদিম মানুষ ভারী বোঝা গড়িয়ে দেওয়ার জন্য গাছের ডাল কেটে নেওয়া গোল গোল লাঠি ব্যবহার করত। কিন্তু এইভাবে খুব অল্প দূরত্বের মধ্যে মালপত্র সরানো সম্ভব ছিল। মন্থরগতি ছাড়া এতে সময়ও লাগে খুব।
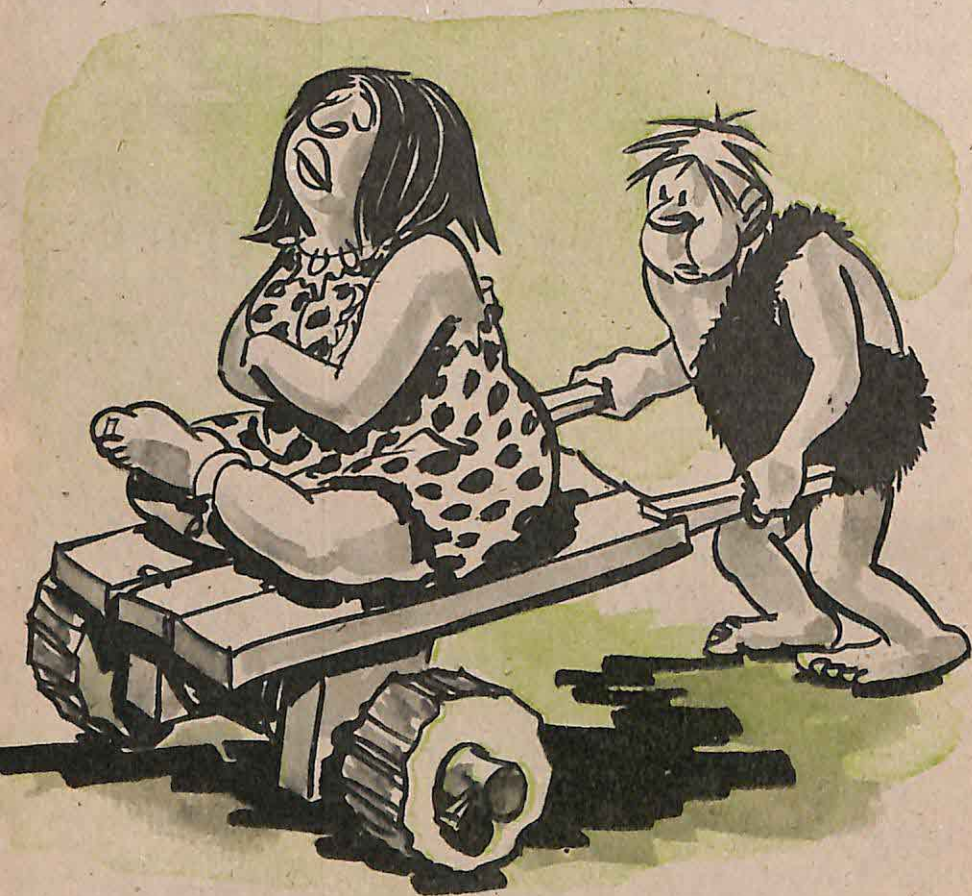
এরপরে নিশ্চয়ই কোনো প্রতিভাধর ব্যক্তি চাকা তৈরী করার কথা ভাবলেন। কিন্তু তাঁর এমন কিছুই জানা ছিল না, যার থেকে চাকার গড়ন ধরতে বা নকল করতে পারেন। প্রাচ্য দেশে, সম্ভবতঃ মেসোপটেমিয়াতে (ইউফ্রাটিস ও তাইগ্রিস্ নদীর মধ্যবর্ত্তী অঞ্চল) প্রথম চাকার উদ্ভব হয়। মহেনজোদরো শহর খননকার্যের সময় দেখা গেল যে দুটি বড় ও মজবুত কাঠের চাকাওয়ালা বলদের গাড়ীর ব্যবহার 4000 বছর আগে প্রচলিত ছিল। এই চাকাগুলির গড়ন প্রায় গোল এবং তিনটি কাঠের তক্তা বা ফালকে ছোট কাঠের টুক্‌রোর কব্জায় আট্‌কে চাকাগুলি তৈরী হয়েছিল।

এইভাবে এল চাকা। পরে চাকার আবিষ্কারক নিশ্চয়ই মোটা গাছের গুঁড়ি থেকে দুটি গোল থালার মত চাক্তি কেটে তাদের মাঝখানে গর্ত করে একটি মজবুত লাঠির দুইপ্রান্তে এঁটে দিলেন। তৈরী হল চক্রনেমি (axle), যার ওপর চাকা সহজেই ঘুরতে পারে। মানুষ নিশ্চয়ই দেখল যে মালপত্র সরানোর জন্য রোলার ব্যবহার করার থেকে চাকার ব্যবহার অনেক বেশী সহজ।

ক্রমে দেখা গেল চাকা যত বড়, বোঝা টানার পরিশ্রমও তত কম। কিন্তু শুধু একটা ধরাবাঁধা আকারের গাছের গুঁড়ি পাওয়াই সম্ভব ছিল। তাই বড় চাকার দরকার হলে, তা বানানোর জন্য কয়েকটি কাঠের টুকরো বা অংশকে একসঙ্গে জোড়া দিতে হত। কাঠের টুকরোগুলি শক্ত করে জোড়া লাগিয়ে গোল মাপে কেটে নেওয়া হত।

ধাতুর আবিষ্কার, আরো বড় ও ভাল চাকা তৈরী করতে সহায়ক হয়। চাকার বাইরের পরিধি ঘিরে একটি সরু ও লম্বা ধাতুর পাত লাগানর ফলে সৃষ্টি হল চাকার বেড় (tyre); যা জোড়া দেওয়া কাঠের অংশগুলি শক্তভাবে ধরে রাখে ও চাকাকে স্বচ্ছন্দে গড়াবার ক্ষমতা দেয়। তা ছাড়া ধাতুর বেড়ওয়ালা চাকা কাঠের চাকা থেকে বেশীদিন টিক্ত। এইভাবে চাকার উপযোগিতা বাড়ল, আর বাড়ল তার আয়ু।

প্রথমে চাকা ব্যবহার হ'ত সেইরকম ঠেলা বা জন্তুটানা গাড়ীতে, যাতে একটি করে চক্রনেমি ও শুধু একজোড়া চাকা থাক্ত। পরে মজবুত কাঠামোতে (frame) দুই বা তার থেকে বেশী জোড়া চাকা লাগিয়ে আরো বড় গাড়ী ও মালগাড়ীর ব্যবহার প্রচলিত হল। এই গাড়ীগুলিতে বোঝাই করা হ'ত ভারী ভারী জিনিষ, টান্ত একদল পশু।

এতদিনে চাকাওয়ালা গাড়ীতে ঘোড়া জুড়ে দেওয়ায় গাড়ীর গতিবেগ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তবে পরের ১৫০০ বছরের মধ্যে চাকার আকৃতি

বা গঠনের কোনো উন্নতি হয়নি। এই নির্দিষ্ট সময়কে বলা হয় "চাকার আঁধার যুগ"।

পাখীওয়ালা (spoke) চাকা আসে অনেক পরে। চাকা ক্রমশঃ আকারে বড় হওয়ায় ওজনেও ভারী হতে লাগল। যে বোঝা বইতে হবে তার সঙ্গে

চাকার ওজন যুক্ত হ'ত। বড় চাকাগুলিকে হালকা করার জন্য কিছু করা দরকার। চাকার বাইরের পরিধিতে কাঠের অংশগুলিকে ধাতুর পাত একসঙ্গে ধরে রাখায় আর ভিতরে ঘন কাঠের দরকার করে না। কিছু কাঠ কেটে বাদ দেওয়া যায়। আগে দরকার সেই চক্রকেন্দ্রের (hub), যার ভিতরে চক্রনেমির দুই প্রান্ত ঢুকবে। এ ছাড়াও প্রয়োজন গোল চাকার বাইরের কিনারা, যার ওপর ধাতুর বেড় বসান হয়। চাকার ভিতরের কাঠের একমাত্র কাজ এই দুটি অংশকে যোগ করে রাখা। ঘন কাঠ বাদ দিয়ে তার জায়গায় সরু ও লম্বা কাঠের ফালি একই কাজ করতে পারে। এই কাঠের ফালিগুলিকেই চাকার পাখী বলে। এতে চাকার ওজন অনেক কমে।

ভারী গাড়ীর ব্যবহার শুরু হওয়ায় আর এক সমস্যা দেখা দিল। কাঁচা রাস্তায়, বিশেষ করে বৃষ্টির পরে ভেজা মাটিতে গাড়ীর চাকা গভীরভাবে বসে যায়। এই জমিতে ভারী বোঝা টানা খুব কষ্টকর। চাকার জন্য উপযুক্ত শক্ত জমির প্রয়োজনেই পাকা রাস্তা নির্মাণ শুরু হল। ইঁট আর পাথরের চাঁই দিয়ে গাঁথা হল প্রধান প্রধান সড়ক ও ছোট রাস্তা। ভাঙ্গা পাথরের টুক্‌রো ছড়িয়ে তার ওপর রোলার চালিয়ে সমতল ও শক্ত রাস্তা তৈরী হল। এইরকম রাস্তা অনেক বেশী গাড়ী ধকল সইতে পারে। এটাই মানুষের মনে গতির নেশা নিয়ে এল।

মানুষ কাঁচা রাস্তায় পশুর মত মন্থর গতিতে চলতে অভ্যস্ত ছিল। তাড়াহুড়োর সময় ঘোড়ায় চড়ে যেত। কিন্তু অসমতল রাস্তায় মানুষ বা ঘোড়া, কারুর পক্ষেই বেশীক্ষণ ঐ গতি বজায় রাখা সম্ভব হত না; অল্পেতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ত। এবড়ো-খেবড়ো পথে বড় বড় কাঠের চাকার প্রতিটি ঝাঁকুনি সহ্য করে যাওয়া সোজা কথা নয়। আরামের কথাতো ওঠেই না।

ক্রমে রাস্তার উন্নতি হল, আর তার সঙ্গে তৈরী হতে লাগল হালকাগাড়ী। অবস্থাপন্ন লোকেরা এই গাড়ী চড়ে দ্রুতগতিতে যেত-আসত। যাত্রাকালীন

আরামের জন্য নানা ধরণের চেষ্টা চলল ; যেমন, ঝাঁকুনী কমাতে গাড়ীকে মজবুত চামড়ার ফিতে দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা। কিন্তু এতে বড় রকমের ঝাঁকুনি খুব একটা কমলো না। গাড়ীর গদির নীচে ধাতুর তৈরী স্প্রিং লাগানোয় অসমতল রাস্তায় দ্রুতবেগে চলার ধাক্কা অনেক পরিমাণে কমে যায়।
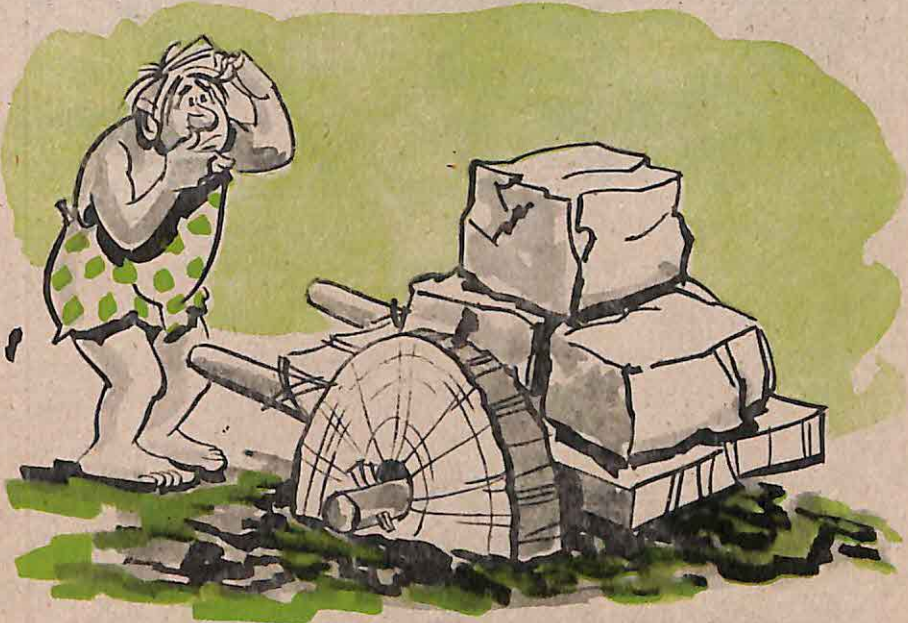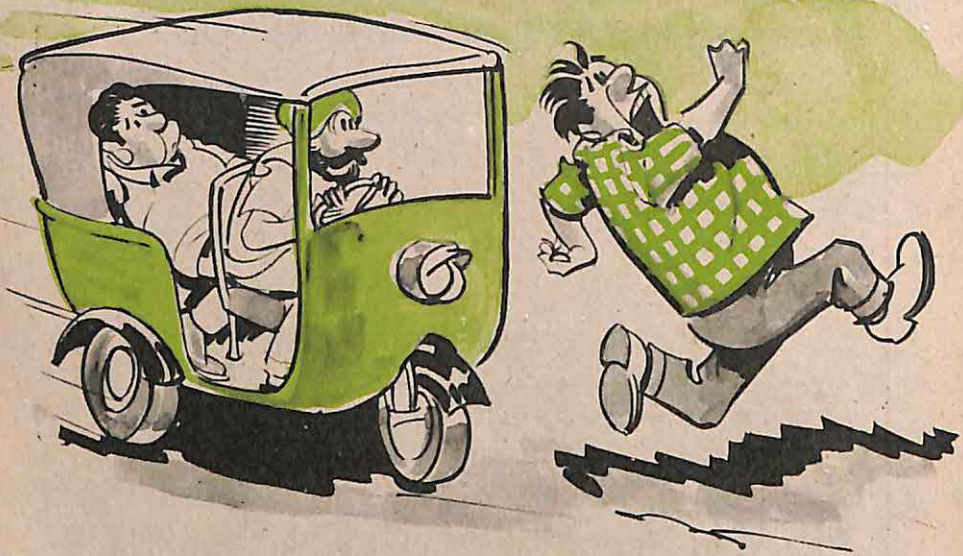
সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ব্রিটেনে আরো ভাল রাস্তা তৈরী হয়। লোকেরা ঘোড়ার গাড়ীতে দিনে প্রায় 30 মাইল করে যেতে পারত। পথের এক একটি বিশেষ জায়গায় পরিশ্রান্ত ঘোড়ার বদলে নতুন বেগে চলার জন্য তাজা ঘোড়া ভাড়া করার ব্যবস্থা ছিল।

রাস্তার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর গতিবেগ বেড়ে যাওয়ায়, জোরে ও স্বচ্ছন্দে ঘুরবে এমন চাকার প্রয়োজন দেখা দিল। শুরু হল চাকা ও রাস্তার মধ্যে উন্নতির প্রতিযোগিতা। বাষ্পীয়-এঞ্জিন ও মোটর গাড়ীর আবিষ্কার দ্রুততর যানবাহনের প্রবর্তন করল। বাষ্পীয়-শক্তিকে প্রথমে রাস্তার ওপরে ব্যবহার করা হয় কিন্তু অচিরেই বোঝা গেল যে রেল্ লাইনের ওপর তার ব্যবহার আরো সহজসাধ্য। ঘোড়ারগাড়ীর যুগে মোটরগাড়ীর গতি ছিল কল্পনাতীত। ওই গতিবেগ সামলাবার জন্য সিমেন্ট, কংক্রীট ও বিটুমেন্ (bitumen) দিয়ে বাঁধিয়ে রাস্তাগুলির অনেক উন্নতি করা হ'ল।

চাকার পক্ষেও এই উন্নতির সঙ্গে তাল রেখে চলার দরকার ছিল। উনবিংশ শতকের শেষ দশকে মোটরগাড়ীর চাকায় ঘন রবারের বেড় পরান হল। তবুও রাস্তা দিয়ে চলার গতিবেগ ছিল মন্থর ও অস্বাচ্ছন্দ্যকর। অবশেষে, পরিবহনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হল। 1888 সালে জন বয়েড ডানলপ (John Boyd Dunlop) নামে একজন ব্রিটিশ পশু-চিকিৎসক বায়ুস্ফীত রবারের টায়ার আবিষ্কার করলেন। এই টায়ারের গুণে চাকারও খুব কদর বাড়ল। ঝাঁকুনি ও ধাক্কা সামলাতে টায়ারের ভিতরের হাওয়া কুশনের মত কাজ করে। বেশী আরামের জন্য ব্যবহার হতে লাগল 'বেলুন টায়ার' নামে একধরণের নরম ও বড় মাপের টায়ার। গোটা চাকাটা ধাতু দিয়ে তৈরী করে তাতে সরু সরু পাখী লাগিয়ে যথাসম্ভব তাকে হালকা করা গেল।

ডানলপ টায়ার প্রথম যে প্রণালীতে তৈরী হয়েছিল, তার প্রয়োগেই আজকের মোটরগাড়ী ও বাইসাইকেল এত দ্রুত ও স্বচ্ছন্দে চলছে। বাই-সাইকেল বা মোটরগাড়ীর চাকা ঠাসা বায়ুর (compressed air) টায়ারের ওপর চলে। চাকার ভিতরের টিউব, নরম ও পাতলা রবারে তৈরী। ভিতরের টিউবের ওপর খাপ খেয়ে বসে যে বাইরের টায়ার, তা খুব শক্ত ও মোটা।

এতে ভিতরের নরম টিউব আঘাত থেকে রক্ষা পায়। এই বায়ুস্ফীত টিউবের জন্যই গাড়ীর গতি যেমন বেড়েছে, তেমনি আরাম।

গাড়ী দ্রুত চলার সময় চক্রকেন্দ্রের জমিতে চক্রনেমির প্রান্তগুলি ঘষা খাওয়ার ফলে যে তাপের সৃষ্টি হয় তাতে প্রচুর ক্ষয় হতে লাগল। এই ক্ষয় যাতে না ঘটে তারজন্য বল-বিয়ারিং (ball-bearing) নামে বিশেষ ধরণের যন্ত্র লাগান হল। এই বলগুলি চাকার সাথে ঘুরতে থাকে এবং তার ক্ষয়-ক্ষতি অনেকটা কমিয়ে দেয়।

ট্রামগাড়ী ও ট্রেনে চাকা ব্যবহৃত হয়, তবে সেগুলি এত ভারী যে সাধারণ রাস্তা তার চাপে ভেঙ্গে পড়ে। তাই এসব গাড়ীর চাকা ইস্পাতের তৈরী বিশেষ রেললাইনের ওপর চলে।

জন্ ডানলপের আবিষ্কার এখন পৃথিবীর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সাইকেল, মোটরগাড়ী ও উড়োজাহাজে এখন এই টায়ার ব্যবহৃত হয়। যে সব লরি বেশ কিছু টন ভারী বোঝা বহন করে নিয়ে যায় এবং উড়োজাহাজ ওড়বার ও নামবার সময় মাটির ওপর প্রচণ্ড গতিতে দৌড়ায়, তারাও এই টায়ারের ওপর নির্ভর করে।

পরিবহনের উপায়গুলির মধ্যে সর্বকালের সবচেয়ে বড় এবং সব থেকে মৌল আবিষ্কার এই চাকা। মানুষের দূরত্ব-বিজয়ের ব্যাপারে আর কোনো আবিষ্কারই এত সাহায্য করে নি। এই আবিষ্কারের ফলে পঞ্চাশ শতাব্দী-ব্যাপী স্থলপথে পরিবহনের ধাঁচ নির্দিষ্ট হয়েছে।

প্রাচীনকালে যে সব জায়গায় যেতে একসময় মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে যেত, আজ তা ঘরের দুয়ারে, অল্প ক'দিনের পথ। প্রায়

5000 বছর আগেকার পশুটানা গাড়ীর মন্থর যুগ ধীরে ধীরে বহু পথ পেরিয়ে 18 শতকের বাষ্পীয়-শক্তির যুগে এসে পড়ল। চাকা আবিষ্কার করেছিলেন যে প্রতিভাধর অজ্ঞাত ব্যক্তি, তাঁর কাছে মানবজাতি চিরঋণী হয়ে আছে।
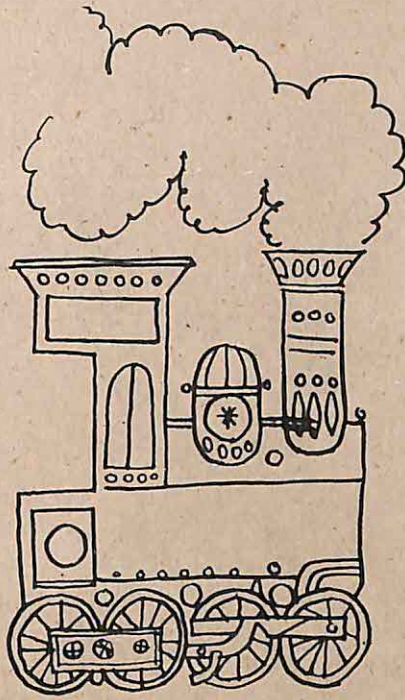
বাষ্পীয় ইঞ্জিন

আজকাল বাষ্পীয় ইঞ্জিন খুব বেশী দেখা যায়। মনে হয় সেগুলি বেশ পুরোনো আমলের জিনিষ। দেখতে মোটেও সুন্দর নয়, অল্প চললেই খুব শব্দ করে। তবে বাষ্পীয়-শক্তিকে ধরে বেঁধে কাজে লাগানো মানুষের এক শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বেশীর ভাগ জাহাজ ও ট্রেন, বিশেষ করে মালগাড়ী বাষ্পীয়-শক্তিতেই চলে। আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের নানা জিনিষ (gadgets) যে সব কারখানায় তৈরী হয়, তার অনেকগুলির যন্ত্রই চলে বাষ্পীয় শক্তির জোরে। আমরা

বায়ুকল

বাড়ীতে, অফিসে ও কারখানায় অনেক কাজে যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করি তা আসলে বাষ্পীয়-শক্তির ওপরে নির্ভরশীল, কারণ এর জোরেই বৈদ্যুতিক শক্তি-উৎপাদনের যন্ত্রগুলি চলে। এমনকি যখন পারমাণবিক শক্তির (atomic energy) ব্যবহার সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হবে, তখনো আমরা বাষ্পীয়-শক্তির ওপর নির্ভর করব। পরমাণু-শক্তি চালিত যন্ত্রে (nuclear reactor) উৎপন্ন তাপ থেকে তৈরী হয় বাষ্পীয়-শক্তি; তার জোরে শক্তি-উৎপাদন যন্ত্রগুলি চলে।

দ্রুতবেগ ও প্রবল শক্তির অন্বেষণে মানুষ বাষ্পীয়-শক্তিকে আবিষ্কার করেছিল।

শক্তির জন্য মানুষ প্রথমে নিজের মাংসপেশীর জোরের ওপর নির্ভর করত। যানবাহনের কাজে পশুদের লাগানোর ফলে দূর-দূরান্তে ভারী মালপত্র নিয়ে যাওয়া ক্রমে সহজ হয়ে গেল। আরো বেশী শক্তির প্রত্যাশায় মানুষ দেখল যে বাতাসও কাজে লাগতে পারে। সে পাল তৈরী করে জলে চালাল নৌকা ও জাহাজ, আর মাটির ওপরে যন্ত্র চালাবার জন্য বানাল বায়ুকল (wind-mill)। কিন্তু বাতাসের ওপরে ভরসা করা গেল না। খুব জোরে বাতাস বইলে নৌকা যাবে ডুবে, আর বায়ুকলগুলিও নষ্ট হয়ে যাবে। আবার বাতাসের জোর না থাকলে জাহাজ চলবে না ও বায়ুকল অচল হয়ে পড়বে।

এরপরে মানুষ ব্যবহার করল জলস্রোতের শক্তি। কোথাও প্রবহমান জলধারা খুঁজে পেলে সেখানে তৈরী হ'ত কলকারখানা। জলের বেগে ঘুরত একটি প্যাডেলের মতো চাকা, সেটা আবার জাঁতা বা ঘানির পেষণ-পাথরগুলি চালাত। তাই লোকে প্রবহমান জলস্রোত খুঁজে পেলে তার কাছে বাড়ী বানাবার চেষ্টা করত। কিন্তু চাইলেই তো আর ওরকম জল-স্রোতের খোঁজ মিলত না। তার ওপরে আবার জলস্রোতের গতিবেগের ওপর সবসময়ে নির্ভর করে বসে থাকাও চলত না। হঠাৎ কখনো জল

শুকিয়ে গেলে কলওয়ালারা নিরুপায় হয়ে পড়তো, কখনো বা বন্যার তোড়ে কলকারখানা ভেসে যেত।

তাই, সর্বদা নির্ভরযোগ্য একটা নিশ্চিত শক্তির উৎস মানুষ খুঁজতে লাগল। ভাগ্যক্রমে সে কয়লা আবিষ্কার করল। কয়লা জ্বল্‌লে তাপ তৈরী হয়। এই তাপ জলকে বাষ্পে পরিণত করতে পারে। মানুষ দেখল, আগুনের ওপরে বসানো মুখ-বন্ধ পাত্রে যে বাষ্পের সৃষ্টি হয়, সেই বাষ্প নিজের

জোরে পাত্রের ঢাকনা খুলে বেরিয়ে আসে। এই শক্তিকে কাজে লাগালে কেমন হয় ?

আসলে বাষ্প কোনো বিশেষ ধরণের শক্তি নয়। উত্তাপের তেজকে ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদনের এটা একটা সহজ উপায়। জ্বলন্ত কয়লার থেকে উৎপন্ন উত্তাপের তেজকেই প্রথম ব্যবহার করা হয় বাষ্পীয় ইঞ্জিনে। অবশ্য আজকাল জ্বলন্ত তেল, বিদ্যুৎ ও আণবিক জ্বালানী দ্রব্য থেকেই আসে
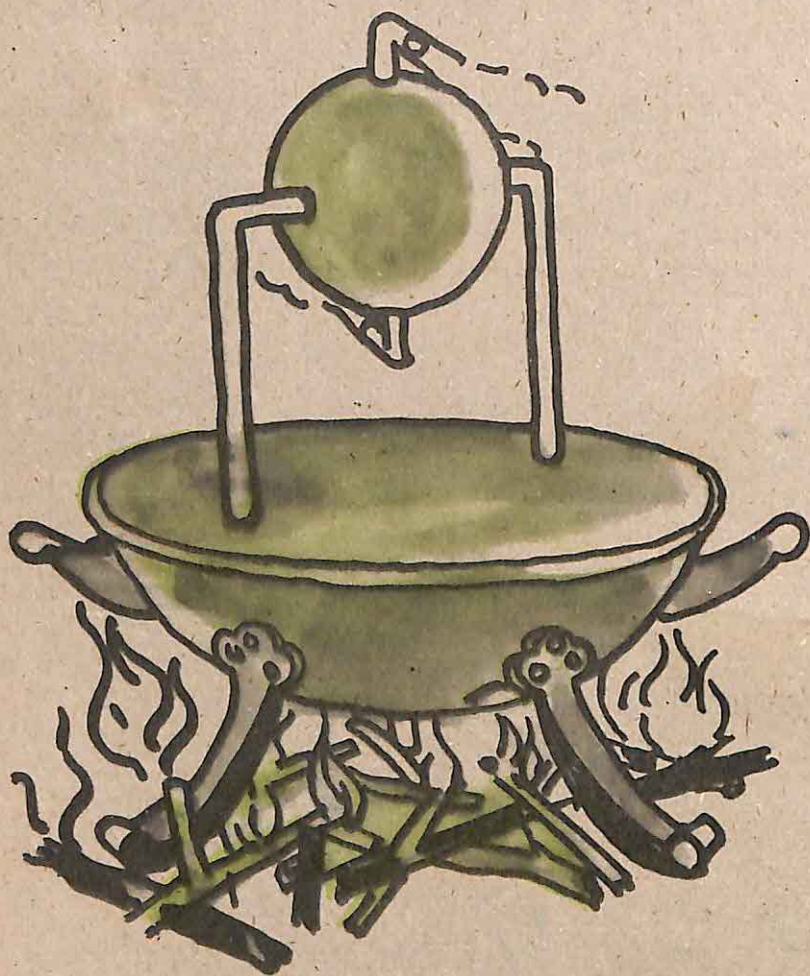
হিরোর বাষ্পীয় ইঞ্জিন

উত্তাপ। এর মধ্যে যে কোনো একটির তাপেই বাষ্পীয় ইঞ্জিন চলতে পারে। প্রথমে এইগুলির থেকে তৈরী তাপ দিয়ে জল ফোটান হয়। ফুটন্ত জল বাষ্প সৃষ্টি করে এবং সেই বাষ্পের জোরে ইঞ্জিন চলে।

বাষ্পীয়-শক্তির বিষয় অনেক কাল আগে থেকে মানুষের জানা ছিল। প্রায় 2000 বছর আগে, আলেকজান্দ্রিয়া (Alexandria) শহরে হিরো (Hero) নামে এক ভদ্রলোক এক ধরণের বাষ্পীয়-যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তিনি একটি গোল ধাতুর পাত্রকে দুই পায়ার ওপরে বসান। এই দুটি পায়ার একটি ফাঁপা। ফাঁপা পায়ার মধ্যে দিয়ে বাষ্প গোল পাত্রে ঢোকে। পাত্রের ভিতরে লাগানো দুটি সরু নল দিয়ে বাষ্প বেরিয়ে যায়। নলগুলি এমনভাবে বসানো যাতে তাদের মুখ বিপরীত দিকে থাকে। ঐ নল দুটি দিয়ে বাষ্প বেরিয়ে এলে, পাত্রটি দুই পায়ার ওপরে ঘুরতে থাকে।

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ মাঠে জল-ছিটানো যন্ত্র (lawn sprinkler) কি ভাবে চলে। তার ফুটো দিয়ে জল ছিটকে বেরুলে যন্ত্রটি সমানে ঘোরে। খানিকটা এইভাবে হিরোর এঞ্জিন ঘুরত।

হিরো বাষ্পীয়-শক্তিকে গতিবেগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কাছে এটা ছিল একটা কৌশল; বা বড় জোর নিছক খেলা। তাই লোকেও শীগ্‌গির এ যন্ত্রের কথা ভুলে গেল।

কয়লাখনিতে বাষ্পীয়-শক্তি প্রথমে কাজে লাগল। খনির ওপরের স্তরের কয়লা শেষ হলে ক্রমশ শ্রমিকরা মাটির আরো গভীরে খুঁড়তে শুরু করে। তার ফলে অনেক সময়ে নীচে থেকে জল উঠে আসে; খনিগুলো জলে-ভর্তি গভীর কুয়ো হয়ে পড়ে। তখন আর কোনো কাজ চলতে পারে না। এমন অবস্থায় কাজ চালু রাখতে হলে শক্তি-চালিত পাম্প-এর সাহায্যে জল বার করে দেওয়ার একটা উপায় ভাবা দরকার।

1698 খৃষ্টাব্দে, টমাস সেভারী (Thomas Savery) নামে একজন ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার খনি থেকে পাম্প দিয়ে জল ওঠাবার জন্য বাষ্প ব্যবহার করলেন। তবে সেভারী তাঁর ইঞ্জিনে বাষ্পীয়-শক্তিকে প্রয়োগ করেন নি; করেছিলেন বায়ুস্তরের চাপ।

বায়ুস্তরের চাপকে কি ভাবে কাজে লাগানো হয় তা একটি অতি সাধারণ ও সহজ পরীক্ষা থেকে বুঝতে পারা যাবে। একটি কাপে জল কানায় কানায় পূর্ণ করে এক টুকরো কাগজ দিয়ে পুরোপুরি ঢেকে দাও। হাত দিয়ে কাগজটি এমনভাবে চেপে ধর যাতে জল না বেরিয়ে আসে। এবারে খুব সাবধানে কাপটিকে ওলটাও। এখন কাগজের নীচে থেকে হাত সরিয়ে নিলে দেখবে যে কাগজটা মোটেও খুলে আসছে না। বায়ুস্তরের চাপে কাগজ আটকে থাকে, নীচে পড়ে যায় না।

ফাঁপা জায়গা সৃষ্টি করার জন্য সেভারী বাষ্প ব্যবহার করেন। একটি নলের ওপরের মুখ বন্ধ করে তিনি তার অন্য দিক জলে ঢুকিয়ে দিলেন। ওই জল পাম্প করে বার করা হবে। নলের ওপরের মুখ দিয়ে ভিতরে ঢোকানো হল বাষ্প। বাষ্পের চাপে নলের মধ্যেকার বাতাস একটা ছোট ফুটো দিয়ে বেরিয়ে গেল। এখন ফুটোটা বন্ধ করে নলের ওপরে জল ঢেলে ঠাণ্ডা করা হল ভিতরের বাষ্পকে। ঠাণ্ডা হওয়ার ফলে বাষ্প পরিণত হল তরল দু-এক ফোঁটা জলে এবং নলের ভিতর শূন্যতার সৃষ্টি করল। এবার বায়ুস্তরের চাপে জল উঠে এল নলের ফাঁপা জায়গায়। উপযুক্ত কোন একটা পদ্ধতিতে এই জল ওপরের একটা জায়গায় প্রবাহিত করা হ'ল। বারবার এই একই উপায়ে জল ওপরে ঠেলে তোলা হ'ত। সেভারীর পরে নিউকোমান (Newcomen) নামে একজন ইংরেজ কামার পাম্পটিকে আরো উন্নত করেন।

এরপরে নাম করতে হয় ট্রেভিথিক (Trevithick) নামে একজন ইংরেজ

ইঞ্জিনিয়ার ও স্কট্‌ল্যাণ্ডের অধিবাসী জেমস ওয়াটের (James Watt)। তাঁরা বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন। এঁরা দুজনে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের অনেক রূপান্তর ঘটান, আজও বাষ্পীয় ইঞ্জিন সেইরকম আছে। বাষ্পকে দুই দিক বন্ধ করা একটি চোঙ বা নলের শূন্য অংশে ঢোকানো হয়। এই চোঙটিকে বলে সিলিনডার (cylinder)। সিলিনডারের ভিতর লাগানো হয় একটি চাপদণ্ড (piston)। ফাঁপা সিলিনডারের ভিতর চাপদণ্ড ওঠা-নামা করতে পারে এবং শক্তভাবে এঁটে থাকার দরুণ একটুও বাষ্প বেরোতে পারে না।

সিলিনডারে ঢুকবার ও বেরিয়ে আসার কতকগুলি পথ থাকে। পথগুলি গতি-নিয়ন্ত্রক কল (valve) দিয়ে খোলা বা বন্ধ করা যায়। যখন বাষ্প সিলিনডারের একদিক দিয়ে ভিতরে ঢোকে, তখন তার চাপে চাপদণ্ড অন্য-দিকে সরে যায়। ঠিক সেইভাবে যখন বাষ্প সিলিনডারের অন্যদিক দিয়ে ঢোকে, তখন চাপদণ্ডটি সরে ফিরে আসে নিজের জায়গায়। চাপদণ্ডের ওঠা-নামায় যে গতিবেগ, তা পাম্প চালানোর কাজে লাগে। উপযুক্ত লিভারের (lever) সাহায্যে এই ওঠা-নামার গতি দিয়ে চাকা ঘোরানো যায়। এই গুরুত্বপুর্ণ আবিষ্কারের ফলে বাষ্পীয়-শক্তির সাহায্যে গাড়ীর চাকা ঘুরল। ফলে গাড়ী নিজেই চলল, পশু দিয়ে টানাবার আর দরকার হল না।

ট্রেভিথিকই প্রথম এই কৌশলটি পরীক্ষা করে দেখেন, তিনিই সর্বপ্রথম রেল ইঞ্জিন তৈরী করেন। 1804 খৃঃ 21 ফেব্রুয়ারী তিনি প্রথম ইঞ্জিনটিকে চালান। এই ধরণের গাড়ী সমতল পথ ছাড়া চলতে পারে না। তাই ট্রেভিথিক 'প্লেট রাস্তা'তে ওই গাড়ী চালিয়েছিলেন। কয়লা বোঝাই গাড়ী যাতে স্বচ্ছন্দে চলতে পারে, তার জন্য রাস্তাগুলি লোহার পাত দিয়ে তৈরী হল। কিন্তু ইঞ্জিন খুব ভারী ছিল। চলার সময় রাস্তার অনেক প্লেট ভেঙ্গেচুরে একশা। কয়লাখনির মালিকরা তাদের 'প্লেট-রাস্তা'র ভাঙ্গাচোরা অবস্থাটা দেখে খুব প্রীত হননি। এই ইঞ্জিন 10 টন লোহা বোঝাই মালগাড়ী টানতে পারলেও তা কেউ ব্যবহার করতে চাইল না।
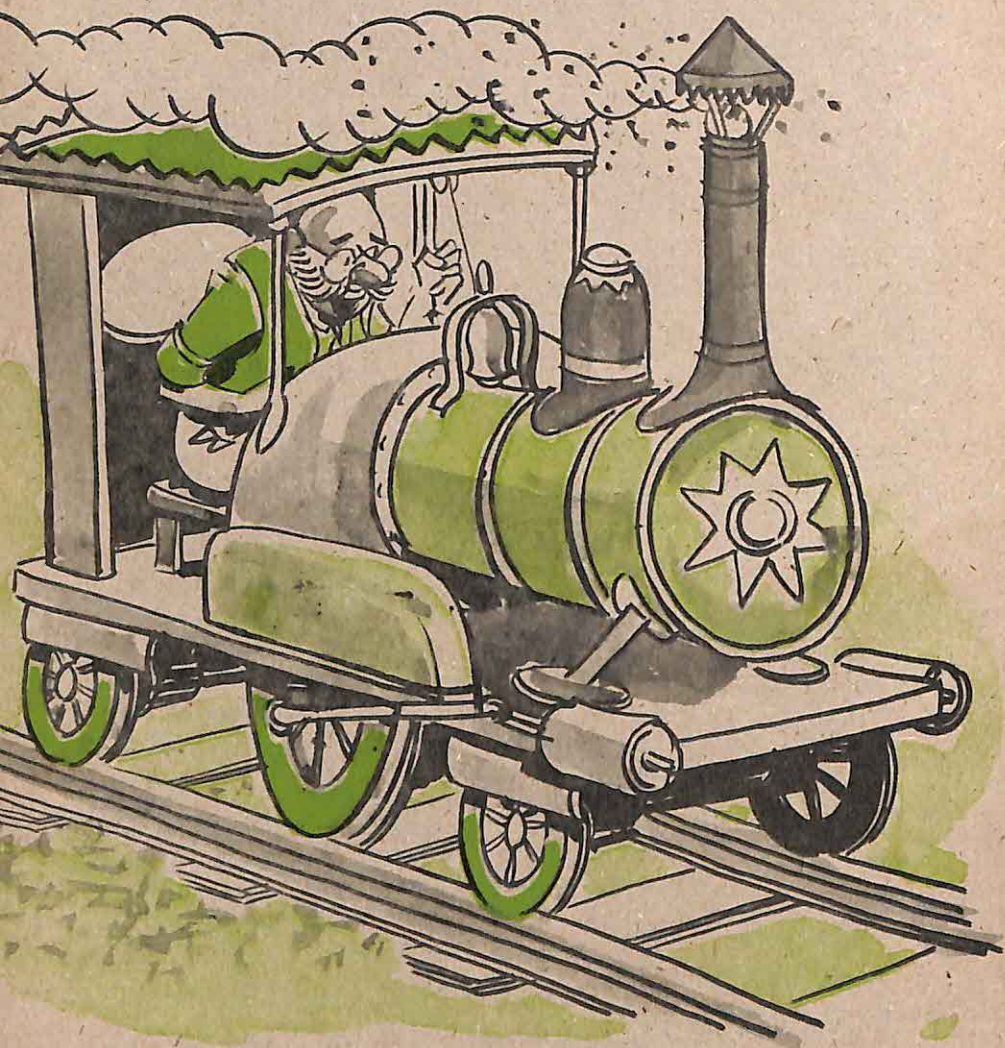
বাষ্পীয় রেলগাড়ীকে আরো নিখুঁত করলেন জর্জ স্টিভেনসন (George Stephenson) নামে একজন ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার। 1814 সালে তিনি খনি থেকে কয়লা বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রথম চলমান রেল ইঞ্জিন তৈরী করেন। তাঁর 'রকেট' নামে রেল ইঞ্জিন 1829 সালে প্রতিযোগিতার পুরস্কার লাভ করে। ম্যানচেষ্টার-লিভারপুর রেললাইনে এটাকে চালানো হয়। বেশ কয়েকটি কামরা ও মালগাড়ী নিয়ে ইঞ্জিন লোহার তৈরী ছুটি সমান্তরাল লাইনের ওপর চলে। তোমরা সবাই নিশ্চয় আধুনিক রেলপথ বা রেললাইন দেখেছ।

পরিবহনের জগতে আধুনিকতার সূচনা করল বাষ্পীয়-রেলগাড়ী। তবে

বাষ্পীয়-ইঞ্জিনই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। ইঞ্জিনের জন্য শুধু যে রেলগাড়ী তৈরী হল তা নয়, এর থেকে নূতন শক্তির উৎস পাওয়া গেল। নূতন রেলপথ তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে রেলগাড়ী যেতে লাগল দূর-দূরান্তে। নানা জায়গায় গড়ে উঠল কারখানা। ওই সব কারখানায় যন্ত্র চালাবার জন্য বাষ্পীয়-শক্তির প্রয়োগ করা হত। বাষ্পীয়-ইঞ্জিন এক যান্ত্রিক যুগের সূচনা করল।

এখন থেকে যে কোন জায়গায় প্রয়োজন মতো এই শক্তি পাওয়া যেতে লাগল। অনিশ্চিত বাতাসের ওপর নির্ভর করে বসে থাকার বা জলস্রোতের
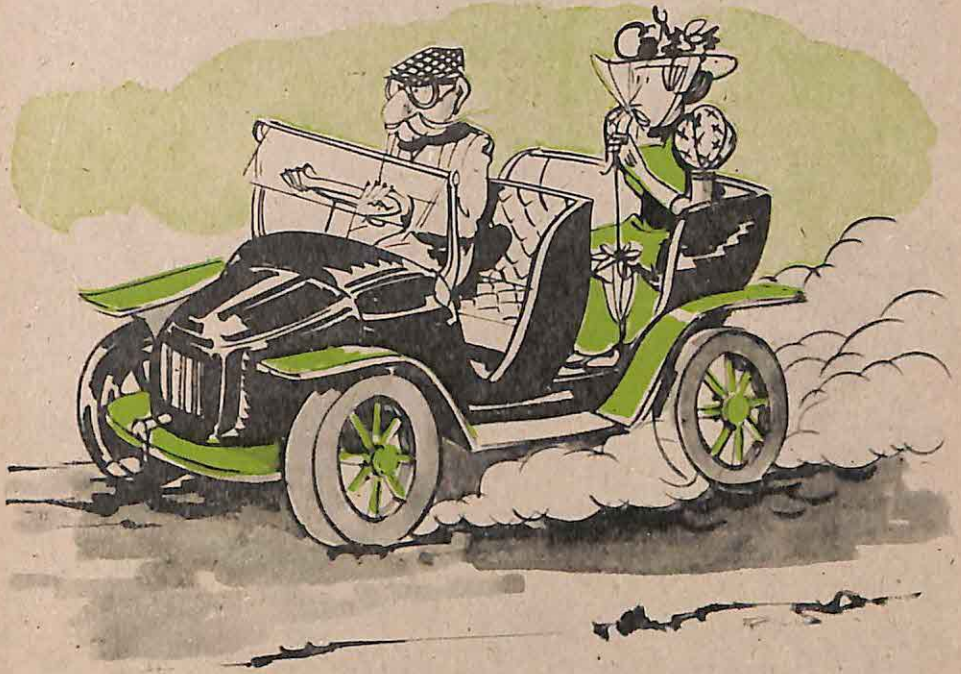
খোঁজে ঘুরে বেড়াবার আর প্রয়োজন রইল না। মানুষের যন্ত্র চালাবার জন্য যেখানে শক্তির দরকার, সেখানে কয়লা পৌঁছে দিতে পারলেই হল। বাষ্পীয় জাহাজ (সাধারণত যাকে স্টীমার বলে) তৈরী হওয়া শুরু হল। বেড়ে উঠল শিল্পবাণিজ্য। যন্ত্রের সাহায্যে তৈরী হতে লাগল অনেক বেশী জিনিষপত্র। ফলে কাঁচামালের নূতন উৎস ও আরো বড় বাজারের জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। সমৃদ্ধ উপনিবেশে সাম্রাজ্য গড়বার আকাঙ্খায় বিভিন্ন দেশ পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হল।

বাষ্পীয়-ইঞ্জিন আবিষ্কারের ফলে পরিবহন ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন এল তা

শুধু ট্রেন বা স্টীমার আবিষ্কারেই থেমে থাকে নি। অনতিবিলম্বে আবিষ্কৃত হল সেইরকম ইঞ্জিন যা নিজেই দহনশক্তিসম্পন্ন (internal combustion engine)। কয়লার জায়গায় ইঞ্জিনে ব্যবহৃত হতে লাগল ডিসেল (diesel) তেল বা পেট্রোল।

একসময়ে যে সব জায়গায় যেতে বহুদিন লাগত, আজ সেখানে আরামে, অল্প সময়ে পৌঁছান যায়। দূর-দূরান্তে কত তাড়াতাড়ি, কত নিরাপদে মালপত্র পাঠানো যায়। কৃষি ক্ষেত্রে ঘোড়া ও বলদের পরিবর্তে এল যন্ত্র-চালিত লাঙ্গল। আজকাল যন্ত্রের সাহায্যে জমিতে হাল দেওয়া, বীজ বপন করা, ফসল কাটা কত তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হচ্ছে।

এই নানাধরনের আবিষ্কারে পৃথিবীটা কত ছোট হয়ে গেছে। দূরত্ব কমে গেছে; সমুদ্র হার মেনেছে, এমনকি আকাশও। দু'শ বছর আগেকার পূর্বপুরুষরা আজ যদি আমাদের এ পৃথিবীতে ফিরে আসেন, এই বিরাট পরিবর্তন দেখলে তাঁরা কি নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারবেন?
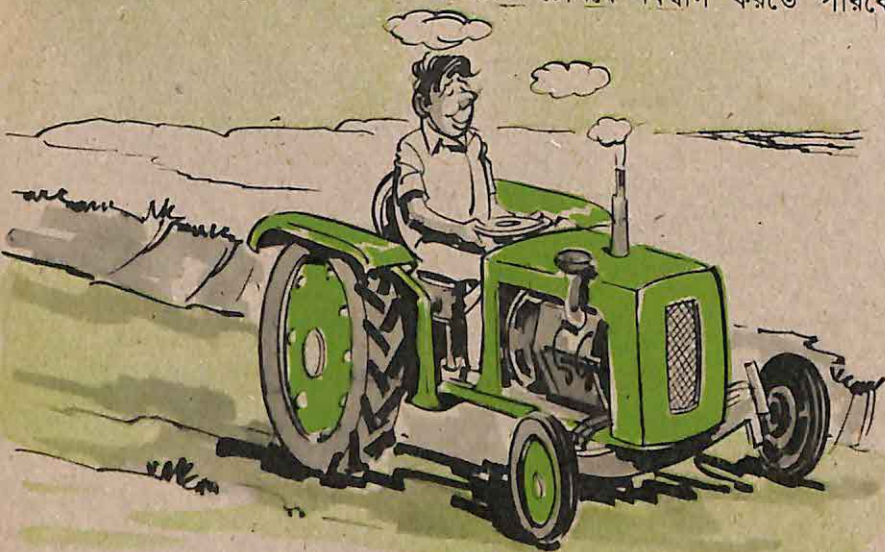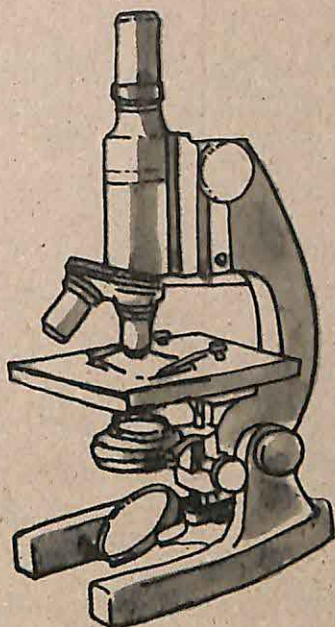
অণুবীক্ষণ যন্ত্র

মানুষের চোখের মতো একটি অসাধারণ ইন্দ্রিয়েরও কিছু কিছু অক্ষমতা আছে। এই যেমন, একটা সীমিত পরিমণ্ডলের মধ্যেই আমরা দেখতে পাই ; দৃষ্টিশক্তির এই সীমাবদ্ধতার অপর নাম দৃষ্টিগোচর অঞ্চল (visible region)। আবার অতি ক্ষুদ্র জিনিষকেও আমরা দেখতে পাই না। কোনোরকম সাহায্য ছাড়া যে জিনিস আমরা দেখতে পাই পরিমাণে তার আকৃতি এক মিলিমিটারের দশ ভাগের এক ভাগ। এর থেকে ছোট কিছু দেখতে হলে বিবর্ধক কাঁচের

(magnifying glass) দরকার। বিবর্ধক কাঁচ ছাড়া অন্যান্য শক্তিশালী যন্ত্রও এই ধরনের কাজের জন্য ব্যবহার হয়; যেমন, অণুবীক্ষণ যন্ত্র। বিবর্ধক কাঁচ বা লেন্সকে (lens) একসঙ্গে জুড়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরী হয়।

চশমা বানাবার জন্য লেন্সের ব্যবহার প্রায় 600 বছর আগে শুরু হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে খুবই দক্ষতার সঙ্গে চশমা তৈরী হত, কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্র তখনো ছিল অজানা। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার সপ্তদশ শতাব্দীতে। দূরবীণের আবিষ্কারক গেলিলিও (Galileo) তাঁর দূরবীণ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার সময় লেন্সগুলির ব্যবধান অজান্তে বাড়িয়ে ফেলেন। ফলে, লেন্স দূরের জিনিষকে আকারে বড় না করে কাছের জিনিষকে আরো বড় করে

দেখায়। এর থেকে শুরু হল অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরী করার চিন্তা। পনেরো বছর ধরে যন্ত্রটিকে নিখুঁত করার জন্য গেলিলিও কম পরিশ্রম করেন নি। তবু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আধুনিক রূপের কৃতিত্ব তাঁর প্রাপ্য নয়। 1590 খৃষ্টাব্দে জ্যাকারিয়াস জ্যানসনের (Zacharias Janssen) তৈরী যন্ত্রের থেকেই সম্ভবত আজকের এই উন্নত ধরনের আধুনিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সূচনা। কিন্তু এই যন্ত্র যে কোনো প্রয়োজনীয় কাজে লাগতে পারে সে কথা তখন কেউ অনুমান করতে পারেন নি।

বিজ্ঞানের জগতে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের গুরুত্ব প্রতিপন্ন করেছিলেন এ্যান্টনি ভান্ লীবেনহুক্ (Antony van Leeuwenhoek) নামে একজন ওলন্দাজ দোকানদার। নিজের অবসর সময়ে তিনি দৃষ্টিতত্ত্ব বা আলোকবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতেন। তিনি সযত্নে ও অসীম ধৈর্যে লেন্সগুলি ঘষতে থাকতেন। এই কাজে লীবেনহুক ক্রমশঃ খুবই দক্ষ হয়ে উঠলেন। তাঁর তৈরী বিবর্ধক কাঁচ দিয়ে দ্রষ্টব্য পদার্থকে তার নিজস্ব আকারের 200 গুণ বড় করে দেখা যেত, যা তখনকার দিনের সবচেয়ে ভাল অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও সম্ভব ছিল না। এক ফোঁটা জলে তিনি দেখতে পেতেন নানা আকারের ও নানা মাপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী। এইগুলিকে তিনি 'ছোট্ট জীব' নাম দিলেন। দেখা যেত যে প্রাণীগুলি কিলবিল করছে এবং একে অন্যের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে ধাক্কা খেয়ে সরে যাচ্ছে। সবচেয়ে যে ছোট প্রাণীকে তিনি দেখেছিলেন, সেগুলিকে পরে জীবাণু নাম দেওয়া হয়। লীবেনহুক কিন্তু বৈজ্ঞানিক নন। এমনকি তিনি ল্যাটিন ভাষাও জানতেন না। সে যুগে বিদ্বান লোকেরা ল্যাটিন ভাষাতেই বই লিখতেন। তাই যা দেখেছিলেন তার মর্ম তিনি বুঝতে পারেন নি। তবে এই লেন্সের মধ্যে দেখা অদ্ভুত প্রাণীজগতের রহস্য তিনি বুঝতে চাইলেন। তাঁকে পরামর্শ দেওয়া হল লণ্ডনের রয়েল সোসাইটিতে (Royal Society) তাঁর আবিষ্কারের কথা লিখে জানাতে। তখনকার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ওই সমিতির সদস্য। লেন্সের মধ্যে দিয়ে যে সব অদ্ভুত জিনিষ দেখেছেন, 1673 খৃষ্টাব্দে তিনি তার বিশদ বর্ণনা বৈজ্ঞানিক সমিতিতে পাঠালেন। সমিতির পণ্ডিতরা চিঠি পেয়ে লীবেনহুকের মতই হতভম্ব হয়ে

গেলেন। চিঠি পড়ে তাঁরা লীবেনহুককে ব্যঙ্গ করলেও তাঁকে লেখা চালিয়ে যেতে বললেন। লীবেনহুক তাঁদের কথা মতো সমানে চিঠি লিখে যেতে লাগলেন। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তিনি 375টি চিঠি পাঠিয়েছিলেন।

লীবেনহুকের প্রথম কয়েকটি চিঠি পাওয়ার পর বৈজ্ঞানিকরা সচেতন হয়ে উঠলেন। চিঠিতে বিবৃত সব অদ্ভুত প্রাণীর কথা তাঁদের মনকে খুবই প্রভাবিত করল। এখন উপহাসের পরিবর্তে তাঁরা জানতে চাইলেন কিভাবে লীবেনহুক তাঁর লেন্স তৈরী করেন, যাতে নিজেরাও ঠিক সেইভাবে তা বানিয়ে ওই সব অদ্ভুত প্রাণীর চাক্ষুষ প্রমাণ পেতে পারেন। কিন্তু নিজের গোপন তথ্য প্রকাশ করতে লীবেনহুক রাজী হলেন না। তাই শুধু তাঁর লেখা পড়েই বৈজ্ঞানিকদের সন্তুষ্ট থাকতে হল।

লীবেনহুকের বিবর্ধক কাঁচের পরে অন্যান্য নানা ধরণের অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হল। রবার্ট হুক্স্‌-এর (Robert Hooks) নির্মিত যন্ত্রটি ছিল সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক, কারণ তাতে এক নূতন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া গেল। তা হল কৃত্রিম আলোকসম্পাত (artificial lighting)।

কোনো পদার্থকে আকারে বড় করে দেখার জন্য সবচেয়ে সোজা উপায় তাকে চোখের কাছে নিয়ে আসা। পঁচিশ সেন্টিমিটার দূরে যে কোনো জিনিসকে চোখ বেশ সহজভাবেই দেখতে পায়। এর থেকে আরো কাছে দেখতে গেলে চোখের পেশীতে ব্যথা করে এবং জোর করে দেখতে অস্বস্তি হয়। তাই কোনো ক্ষুদ্র পদার্থ বড় করে দেখার জন্যে বাহ্যিক সাহায্যের প্রয়োজন। কেবলমাত্র একটি লেন্সের ভিতর দিয়ে বস্তুকে আকারে দশ গুণ বড় করে দেখা যায়; একে অবশ্য এক ধরণের সাধারণ অণুবীক্ষণ বলা যেতে পারে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পদার্থকে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর করে দেখা সম্ভব। এই যন্ত্র দিয়ে কোনো পদার্থকে হাজার গুণ বা তারও বেশী বড় করে দেখা সম্ভব।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে লেন্সের দু'রকম ব্যবস্থা রয়েছে। তাদের মধ্যে একটির

নাম অভিলক্ষ্য (objective) ও অন্যটি অভিনেত্র (eye-piece)। যে লেন্স
দ্রষ্টব্য বস্তুর দিকে ঘোরানো থাকে তার নাম অভিলক্ষ্য এবং অভিনেত্র হল
সেই লেন্সটি, যার মধ্যে চোখ লাগিয়ে দেখা হয়। এই দুই ধরণের লেন্সের
উদ্দেশ্যই হল দ্রষ্টব্য বস্তুর বিবর্ধন।

স্লাইড (slide) বা দুটি পাতলা কাঁচের পাতের মধ্যে দ্রষ্টব্য বস্তুটিকে
রাখা হয়। স্লাইড্‌গুলি নীচের দিকের লেন্সের তলায় ধরা হয় এবং তার নীচে
থাকে একটি আয়না। দ্রষ্টব্য পদার্থের প্রতিবিম্বকে উজ্জ্বল ও স্পষ্ট করার জন্য
আয়নাটাকে ঘুরিয়ে পদার্থের ওপর আলো ফেলা হয়। শক্তিশালী ও জটিল
অণুবীক্ষণ যন্ত্রগুলিতে একটি বিশেষ ধরণের আলোকসঞ্চয়ী কাঁচ (Con-
denser) থাকে, যা দিয়ে দ্রষ্টব্য বস্তুর ওপর আলোকে কেন্দ্রীভূত করা যায়।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র ধীরে ধীরে উন্নত হল। গোড়ার দিকে যন্ত্রগুলিতে একটি খুঁত ছিল। যন্ত্রের ভিতরে দ্রষ্টব্য প্রতিবিম্বের ধারগুলিতে রঙের পাড় দেখতে পাওয়া যেত। আমরা জানি ত্রিভুজাকৃতি ঘন কাঁচ বা প্রিজম্ কাঁচের (prism) মধ্যে রামধনুর বর্ণালী চোখে পড়ে। অণুবীক্ষণের লেন্সেও প্রিজমের মতো অনেক রঙ দেখা যায়। তাই গোড়ায় অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ধৃত প্রতিবিম্বে রঙের পাড় ফুটে ওঠায় দ্রষ্টব্য বস্তু ঝাপসা দেখাত।

মাত্র 1830 খৃষ্টাব্দে জোসেফ্ জ্যাক্সন লিসটার (Joseph Jackson Lister) নামে একজন চক্ষুবিশারদ প্রথম অ্যাক্রমেটিক্ (achromatic) বা অবার্ণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরী করেন। এই যন্ত্র রঙের পাড় দূর করল এবং প্রতিবিম্বগুলি হয়ে দাঁড়াল স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মূল কাজ- হচ্ছে কোনো পদার্থের বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব চোখের মণির সামনে তুলে ধরা। যে জগৎ আমাদের দৃষ্টির অগোচরে ছিল, এই যন্ত্রের সাহায্যে তাকে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোনো বস্তুকে শুধু আকারে বড় করে দেখাই যথেষ্ট নয়। অণু-বীক্ষণ যন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হচ্ছে এর বিশ্লেষণী শক্তি (Resolving power), যার জোরে আমরা দ্রষ্টব্য জিনিষের প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র অংশকে পৃথক করে দেখতে পাই। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে বিবর্ধিত বস্তুর প্রত্যেকটি সুক্ষ্ম অংশ স্পষ্ট হয়ে না উঠলে, তা শুধু আকারে বড় হয়ে অস্পষ্ট থেকে যেত।

ব্যাক্টিরিয়া, মাইক্রোব, ব্যাসিলি ও অন্যান্য অতি ক্ষুদ্র রোগবীজবাহী জীবাণুগুলি এত ছোট যে সর্বাধিক শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও তা দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। এর পরে আবিষ্কার হল যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে আমরা যে সব ক্ষুদ্র পদার্থগুলি দেখতে পাই, তার পরিবর্ধন আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (wave-length) দ্বারা নির্ণীত হয়, যা পদার্থকে আলোকিত করে।

বোঝা গেল যে ছোট ছোট পদার্থ দেখবার জন্য ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোক-রশ্মি ব্যবহার করা দরকার। আলট্রা-ভায়লেট রশ্মির (ultra-violet ray) প্রয়োগ এবং স্ফটিকে তৈরী লেন্স দিয়ে তাকে কেন্দ্রীভূত করে

তৈরী হল অত্যনীবেক্ষণ যন্ত্র (ultra-microscope)। এই যন্ত্রের সাহায্যে যে সব ক্ষুদ্র পদার্থ দেখা সম্ভব তা অপটিক্যাল্ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে (optical microscope) দেখা সব থেকে ছোট জিনিসের চাইতেও দুভাগ ছোট।

রঞ্জনরশ্মিতে (X-ray) তোলা ছবির বিষয় তোমরা সকলেই জান। আমাদের শরীরের কোনো অঙ্গের ভিতরকার ছবি তোলার জন্য হাসপাতালে রঞ্জনরশ্মি ব্যবহার করা হয়। রঞ্জনরশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সাধারণ আলোকরশ্মির থেকে ছোট হওয়ায় সহজেই আমাদের শরীরের ভিতর দিয়ে যেতে পারে। তাই রঞ্জনরশ্মি-যুক্ত অণুবীক্ষণ (X-ray microscope) থাকলে তা খুবই শক্তিশালী যন্ত্র হতে পারত। কারণ, আলট্রা-ভায়লেট রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের
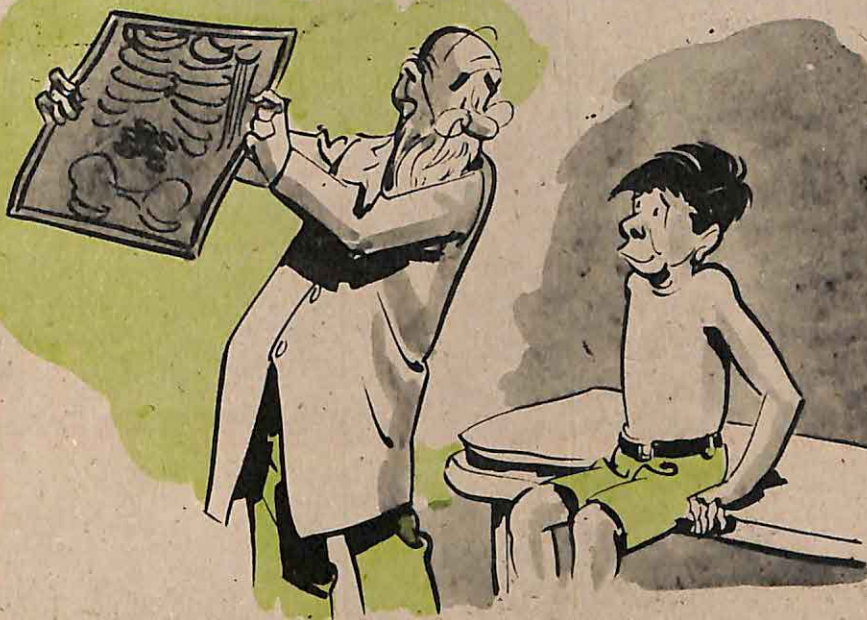
থেকেও রঞ্জনরশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত ছোট। যে লেন্সের সাহায্যে রঞ্জনরশ্মির কেন্দ্রীভূত সম্পাত সম্ভব হতে পারে তার অভাবে এই ধরণের অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরী করা যায় নি।

এখন নানাধরণের অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরী হয়েছে। ডাক্তার, জীববিজ্ঞানী, ভূবিজ্ঞানী এবং অন্যান্যদের কাজের জন্য আছে রাসায়নিক (chemical), প্রক্ষেপক (projecting), ও গবেষণামূলক (research) অণুবীক্ষণ যন্ত্র। সাধারণভাবে দৃশ্যমান আলোর পরিবর্তে আলট্রা-ভায়লেট আলো ব্যবহার করলে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে কোনো পদার্থকে তার প্রকৃত আকারের 5000 গুণ বেশী বড় করে দেখা যায়।

বৈজ্ঞানিকদের হাতে অণুবীক্ষণ একটি খুবই শক্তিশালী যন্ত্রে পরিণত হল। লুই পাস্তুর (Loui Pasteur ; 1822-1895) নামে একজন ফরাসী রসায়নবিদ আবিষ্কার করলেন যে কোনো কোনো জীবাণু রোগের সৃষ্টি করে। লীবেনহুক্‌ই প্রথম এই জীবাণুগুলিকে দেখেছিলেন ; ব্যাপারটা ঘটেছিল এই ভাবে।

সেই সময় ফরাসী দেশে মদ তৈরী শিল্পে খুবই মন্দা চলছে। কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে সমস্ত মদ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। তাঁর অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পাস্তর ধরতে পারলেন যে এই নষ্টের মূলে আছে ছোট্ট ছোট্ট জীবাণু। তিনি বললেন যে মদকে 140° ফারেনহাইটের তাপে গরম করলে জীবাণুগুলি সব মরে যাবে এবং মদও নষ্ট হবে না। তাই, তাপপ্রয়োগে এই ভাবে জীবাণুমুক্ত করাকে "পাস্তুর প্রণালী" (pasteurisation) বলে। যখন ফরাসী দেশের রেশমগুটিগুলিও বিনাকারণে মরে যাচ্ছিল, তখন পাস্তর রেশম শিল্পকেও ঠিক এমনিভাবে বাঁচিয়ে দেন।

উন্নত অণুবীক্ষণ যন্ত্র সারা ছনিয়ার ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিকদের রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে সাহায্য করে। সেই সংগ্রাম এখনও চলছে। অনেক

সময়েই ডাক্তাররা এমন ধরণের রোগ নির্ণয়ের সমস্যায় পড়েন যার কারণস্বরূপ কোনো জীবাণু খুঁজে পাওয়া যায় না। কারো কারো ধারণা যে, যে সব রোগ-বীজবাহী জীবাণু থেকে এই ধরণের অসুখ হয় সেগুলি এতই ক্ষুদ্র যে তা

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমেও ধরা পড়ে না। এই জীবাণুকে ধরার জন্য এক ধরণের ফিলটারের (filter ; তরল পদার্থ ছাঁকার যন্ত্র) আবিষ্কার হয়েছে, কিন্তু মাইক্রোবগুলি ফিলটার দিয়েও সোজা বেরিয়ে চলে যায়। তাই এইগুলির নাম 'ফিলটার অতিক্রমকারী জীবাণু' (filter-passing viruses)।

তার পরে আবিষ্কৃত হল এক নূতন ধরণের অণুবীক্ষণ যন্ত্র। তার নাম ইলেকট্রন যন্ত্র (electron microscope)। 1923 খৃষ্টাব্দে ভন্ বরিস (Von Borries) ও রাসকা (Ruska) নামে দুইজন এই যন্ত্রটি প্রথম তৈরী করেন। সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যেমন রশ্মিগুচ্ছ (beam of light) ব্যবহার করা হয়, তেমনি ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে তার জায়গায় ব্যবহার হয় ইলেকট্রন রশ্মিগুচ্ছ। পরমাণুর (atom) অন্তর্ভুক্ত অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাকে ইলেকট্রন বলে। সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ব্যবহৃত লেন্সের পরিবর্তে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে থাকে চুম্বক। এই চুম্বকের টানে ইলেকট্রন রশ্মিগুচ্ছ বেঁকে প্রতিবিম্বের সৃষ্টি করে।

আজকের দিনে সবচেয়ে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যে ক্ষুদ্রতম পদার্থকে দেখা যায়, তার থেকেও 200 ভাগ ছোট বস্তুকে দেখতে পাওয়া যায় ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে। অর্থাৎ, ওই যন্ত্র কোনো বস্তুকে আকারে 300,000 গুণ বড় করতে পারে। এটা কল্পনা করা খুবই শক্ত ব্যাপার। কারণ, যদি মাছিকে আকারে 300,000 গুণ বড় করে দেখি, তাহলে ভাবো তা প্রায় দুই কিলোমিটার লম্বা হবে! রোগ সংক্রামক জীবাণুর ও কর্কট রোগ সংক্রান্ত গবেষণায় অণুবীক্ষণ যন্ত্র আজকাল অত্যন্ত জরুরী। এই যন্ত্র বৈজ্ঞানিকদের নানাধরণের ব্যাধির কারণ ছাড়াও অনেক অজানা জীবাণুকে চিনতে সাহায্য করে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রগুলিকে আরো শক্তিশালী করার জন্য চলছে আপ্রাণ প্রচেষ্টা। হয়তো সেদিন খুব দূরে নয়, যখন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পরমাণুকে যথার্থভাবে দেখা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র অন্যান্যভাবেও কাজে লাগে। পাথরের, স্ফটিকের বা ধাতুর

S 5 12 19 26
M 6 13 20 27
T 7 14 21 28
W 1 8 15 22 29
T 2 9 16 23 30
F 3 10 17 24 31
S 4 11 18 25
1971
60!
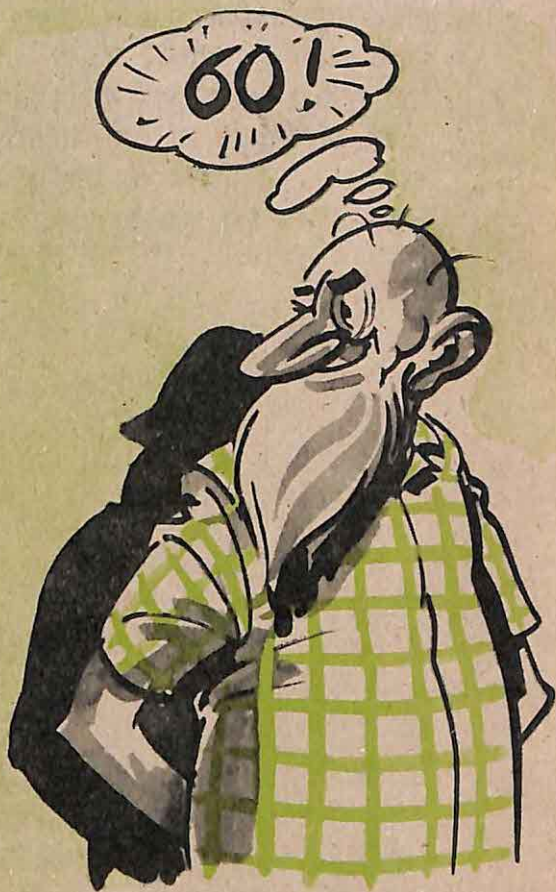
খুঁত নির্ণয়ের জন্য এই যন্ত্রকে ব্যবহার করা হয়। আমাদের শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ যে ছোট ছোট জীবকোষ দিয়ে তৈরী, তার বেশীর ভাগই একমাত্র অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা সম্ভব। জীবকোষের অন্তর্নিহিত যে সব ক্ষুদ্র দেহাণু আছে, সেগুলি আমাদের জীবন ও বংশগতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রজননশাস্ত্রে বা বিজ্ঞানে এখন এই দেহাণুগুলি নিয়ে গবেষণা চলছে। তার মধ্যে কয়েকটি ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রতেও ধরা পড়ে না। আমাদের পূর্বপুরুষরা 35 বছরের বেশী বাঁচার আশা রাখতেন না, কিন্তু আজ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যে জ্ঞান পাওয়া গেছে তার ফলে আমাদের পরমায়ু দ্বিগুণ বেড়েছে। অণুবীক্ষণের সাহায্যে আরো যে সব নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হতে পারে তারজন্য জগৎ আজ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।
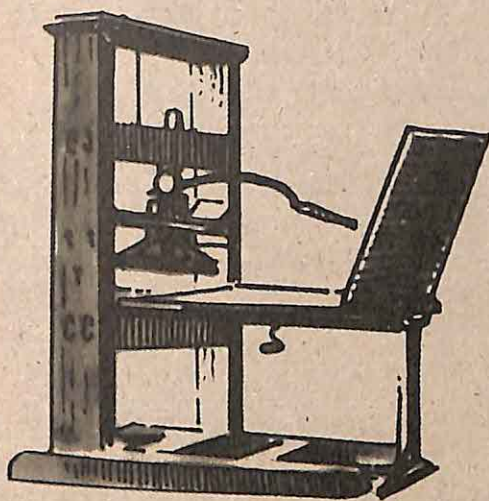
ছাপাকল

আজ থেকে প্রায় 30,000 বছর আগে মানুষ রেখা ও রঙ দিয়ে ছবি আঁকতে শুরু করে। সেই সময় মানুষ নিজে বুদ্ধির বলে ও হাতের দক্ষতায় জন্তুর থেকে অনেক উন্নত। অনেক বেশী শক্তিশালী জন্তু শিকার করার ক্ষমতা তখন তার করায়ত্ত। অস্ত্রের সাহায্যে ও ফাঁদ পেতে মানুষ জীবন-ধারণের উপায় সহজ করেছে।

কোনো বিশেষ কাজে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করা ছাড়াও নিজের পটুতায় আনন্দ লাভ করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। নিজের যে কত ক্ষমতা এটা জানার আত্মবিশ্বাস কম নয়। রেখাচিত্র আঁকা বা রঙ-তুলি নিয়ে তন্ময় হতে কত আনন্দ। আর এ যদি মানুষের কাছে খুব আকর্ষণীয় মনে হয় তবে সেটা তো খুব স্বাভাবিক।

প্রাচীনকালের রেখাচিত্র ও রঙিন চিত্রগুলি শিল্প না হলেও সম্ভবত খানিকটা যাদুমন্ত্র বা রক্ষাকবচের মতো ছিল। জন্তুর তীর বা বর্শায় বিদ্ধ ছবি এঁকে মানুষ বিশ্বাস করত যে এই ধরণের ছবি আঁকলে তার ভাগ্য খুলবে এবং শিকারে গেলে জন্তুকে বধ করা সহজ হবে। তাই, মানুষ শুধু যে

নিজের দক্ষতা জাহির করবার জন্য ছবি আঁকত তা নয়, ছবির মধ্যে সে প্রকাশ করত তার ভয়-ভাবনা, লাভ করত বল ও ভরসা।

মানুষ যত এগিয়ে গেল তত সে চাইল তার চিন্তাধারা, আশা-নিরাশা ও ভয়-ভাবনা তাঁর আঁকা ছবিতে প্রতিফলিত হোক। এর থেকেই লেখার আবিষ্কার। এই কারণে স্বভাবতই প্রাগৈতিহাসিক সব লেখার আঙ্গিক আঁকা ছবির মতো। প্রাচীন মিশরীয়রা তাদের লেখায় এই ধরণের সঙ্কেত-চিহ্ন ব্যবহার করত। তবে তারাও নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল যে এইভাবে লিখলে খুব সময় নষ্ট হয় এবং তা বেশ ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার। ক্রমে ক্রমে আরো সহজ ও সাধাসিধে লেখার ধরণ চালু হল।

লিখতে পারার ব্যাপারটা মানুষের জীবনে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করে। এখন থেকে বড় বড় মনীষীরা যা ভাবতেন ও লিখে যেতেন—তা পরবর্তীকালের সম্পদ হয়ে রইল। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কীর্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারত না। উত্তরসূরিদের হাতে তাঁদের চিন্তাধারা তুলে দেওয়া যেত। এমনি ভাবে জ্ঞান-চর্চার ধারাবাহিকতা রক্ষা পেল। বই হয়ে উঠল মহান চিন্তার ও জ্ঞানের ভাণ্ডার।

রাজা-মহারাজা ও অভিজাত ব্যক্তিরা তাঁদের সভায় কয়েকজন বিশেষ লোক রাখতেন। বিখ্যাত বইয়ের অনুলিপি করা ছিল এদের একমাত্র কাজ। পৃথিবীর সর্বত্রই পুরোহিতগোষ্ঠীর একটা অংশ এই একই কাজে নিযুক্ত থাকতেন। কিন্তু হাতে লিখে নকল করা অনেক সময়ের ব্যাপার। সারা জীবন পরিশ্রম করার পরেও মাত্র কয়েকটি পুঁথি লেখা সম্ভব হতো।

বই ও তার প্রতিলিপি সংখ্যায় ছিল কম, দামও হত খুব বেশী। নিজের মনমত বইয়ের খোঁজে পণ্ডিতব্যক্তিদের হাজার হাজার মাইল ঘুরে বেড়াতে হত। তাই খুব অল্প লোকই যে লেখাপড়া শিখেছিল এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিছু কিছু লেখাপড়া জানা লোক অন্যদের শিক্ষা দিতেন। তবে

তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রতারণার জন্য বা অসৎ উদ্দেশ্যে বিদ্যার প্রয়োগ করতেন। সাধারণ লোকের অবস্থা ছিল নিরুপায়। তাদের সত্যাসত্য বিচার করে দেখবার কোন উপায় ছিল না ; যা শুনত তাই তাদের মেনে নিতে হত।

এরকম অবস্থা চিরদিন চলতে পারে না। বিনা প্রশ্নে সব কিছু মেনে নেওয়াতে মানুষ রাজী নয়। যে সব প্রশ্নের সঠিক জবাব মেলে নি, তারা তা জানতে চাইল। ক্রমে শুরু হল পুরানো সব চিন্তাধারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কি করবে বা না করবে সে সম্পর্কে মানুষ শুধু আর অন্যের নির্দেশ পেয়েই সন্তুষ্ট নয় ; করা না করার কারণগুলি তারা জানতে চাইল।

চতুর্দশ শতাব্দীর ইওরোপে ঘটনার দ্রুত পরিবর্তন ঘটল। এই প্রথম নিজের থেকে দেখবার ও ভাববার জন্য মানুষের ঝোঁক প্রবল হয়ে হয়ে উঠেছে। তারা তখন শুনেছে দূর-দূরান্তের দেশের কথা, নানা আশ্চর্য ও বিস্ময়কর কাহিনী। তার কতটা সত্য তা জানার জন্য এবার শুরু হল জাহাজ ভাসিয়ে যাত্রা। পুরোনো চিকিৎসাশাস্ত্রের বইগুলি তারা পুড়িয়ে দিল; কবর থেকে মৃতদেহ তুলে দেখতে চাইল মানবদেহের সংগঠন এবং তার কর্মপ্রণালী।

এমনি করে বিজ্ঞানের উদ্ভব। সব কিছুই এসে পড়ল মাপজোকের আওতায়। আকাশে গ্রহনক্ষত্রের পরিচয় জানবার জন্য কাজে লাগল দূরবীণ। মানুষের সামনে খুলে গেল জ্ঞানের দুয়ার। নূতন নূতন আবিষ্কারগুলিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য ক্রমশঃ আরো বইয়ের প্রয়োজন হতে লাগল। জ্ঞানের আহরণ সকলের মঙ্গলের জন্য, মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্য তা আবদ্ধ থাকতে পারে না।

ঠিক সময়ে ছাপাকলের আবিষ্কারে এটা সম্ভব হল। ছাপা গেল হাজার হাজার বই। ফলে, শুধু যে জ্ঞানচর্চ্চা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল তা নয়, নতুন ধারণা ও চিন্তায় মানুষ তার মুক্তি খুঁজে পেল।

সম্ভবত ইওরোপে ইওহান্ গুটেনবর্গ্ (Johann Gutenberg ; 1397–1468) নামে একজন জার্মান মুদ্রণ-পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। অবশ্য চীনদেশে এবং কোরিয়াতে যে ধরনের মুদ্রাক্ষর (type) ব্যবহার করা হতো তা বোধহয় আরো পুরনো কালের। তবে গুটেনবার্গ এই সব দেশ থেকে ছাপার ধারণা পাননি।

গুটেনবার্গ ছাপার জন্য পরিবর্তন-যোগ্য মুদ্রাক্ষর ব্যবহার করতেন। অর্থাৎ, তিনি প্রতিটি অক্ষরের জন্য আলাদা ছাঁচ তৈরী করতেন এবং ওই ছাঁচের অক্ষর বা মুদ্রাক্ষরগুলিকে একসঙ্গে সাজিয়ে শব্দ, লাইন বা পৃষ্ঠা ছাপতেন। তিনি 1436 বা 1437 খৃষ্টাব্দে মুদ্রণ-পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তাঁর জন্মস্থান মায়ণ্টস্এ (Mainz) একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। এইখানেই ইওরোপের প্রথম বই ছেপে বের হয়। সেই বইয়ের নাম বাইবেল এবং ম্যাজারিন বাইবেল *(Mazarin Bible)* নামে বিখ্যাত।

ইওরোপের চতুর্দিকে ছাপার কৌশল তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে।

পুরনো ধরনের ছাপাকল

1476 খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম ক্যক্সটন্ (William Caxton) বিলেতে ছাপাখানা প্রবর্তন করলেন। 1539 খৃষ্টাব্দে মেক্সিকোতে (Mexico) ছাপার কাজ আরম্ভ হয় এবং 100 বছর পরে, আমরা আজ যাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলি, সেখানে প্রথম বই ছেপে বেরিয়েছিল।

গোড়ার দিকে ছাপাখানায় মুদ্রাক্ষরগুলিকে হাত দিয়ে একটি কাঠামোতে সাজানো হতো। এই কাঠামোর নাম ফর্মা (formes)। মুদ্রাক্ষরের ওপরের দিকে কালির রোলার (roller ; বেলনাকার দণ্ড) চালিয়ে কালি লেপা হত। এবারে একটি কাগজ তার ওপরে রেখে জোরে চাপ দেওয়ায় পরিষ্কার অক্ষরের ছাপা বেরিয়ে আসে। আজকার দিনেও ছোটখাটো কাজের প্রয়োজনে মুদ্রাক্ষরগুলিকে হাতে সাজানো হয় এবং ট্রিডল যন্ত্র (treadle ; পা দিয়ে প্যাডেল্ করে চালানো যন্ত্র) দিয়ে ছাপানো হয়।

হাতে মুদ্রাক্ষর সাজানোর পদ্ধতিতে অনেক সময়ের অপচয়। উনবিংশ শতকের শেষ দিকে মুদ্রাক্ষর সাজানোর জন্য অনেকগুলি যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল। তাদের মধ্যে 'লাইনোটাইপ' (linotype) ও 'মনোটাইপ' (monotype) বলে দুটি যন্ত্র সবচেয়ে বেশী প্রচলিত।

1884 খৃষ্টাব্দে ওটমার মারগেনথালার (Ottmar Mergenthaler) লাইনোটাইপ যন্ত্র তৈরী করে বাজারে ছাড়েন। এই যন্ত্রে 'স্লাগ' (slug ; ঢালাই করা পুরো লাইন) তৈরী হয় এবং হাতে মুদ্রাক্ষর সাজিয়ে লাইন তৈরী করার কাজ প্রতিটি 'স্লাগ' করে। টাইপরাইটারের (typewriter) মত এই যন্ত্রে টেপার জন্য কতকগুলি চাবি আছে। এর এক একটি চাবি টেপা মাত্র একটির পর একটি মেট্রিকস্ (matrix) বা ছাঁচ এসে লাইন তৈরী হয়ে যায়। এভাবে একটি পুরো লাইন তৈরী হওয়ার পরে সেই ছত্রটি মুদ্রণের উপযুক্ত কোনো ধাতুতে (type-metal) ঢালাই করে নেওয়া হয়। ঢালাই হয়ে যাওয়ার পর মেট্রিকস্‌গুলি যথাস্থানে ফেরত চলে

যায়। এই ধাতুর ঢালাই লাইন বা স্লাগগুলিকে সাজিয়ে একটি পৃষ্ঠার বিন্যাস করা হয়। ছাপার পরে স্লাগগুলিকে গলিয়ে সেই ধাতু দিয়ে নূতন স্লাগ তৈরী করা হয়।

'মনোটাইপ' যন্ত্র পরিবর্তনযোগ্য মুদ্রাক্ষর তৈরী করে। অর্থাৎ এই যন্ত্র এক একটি অক্ষরের আলাদা ছাঁচ তৈরী করে এবং সাজায়। 1887 খৃষ্টাব্দে টলবার্ট ল্যানস্টন (Tolbert Lanston) নামে একজন আমেরিকান এই যন্ত্রের প্রবর্তন করেন। আসলে দুটি যন্ত্র মিলিয়ে 'মনোটাইপ' যন্ত্রের সৃষ্টি। প্রথমটি ঠিক টাইপরাইটারের মতো এবং টেপার চাবি আছে। চাবি টিপলে একটি কাগজের ফিতেতে অক্ষরের নকশা হতে থাকে। এখন ওই কাগজের রোলটিকে কাস্টার (caster; ছাঁচে ঢালার যন্ত্র) নামে অন্য
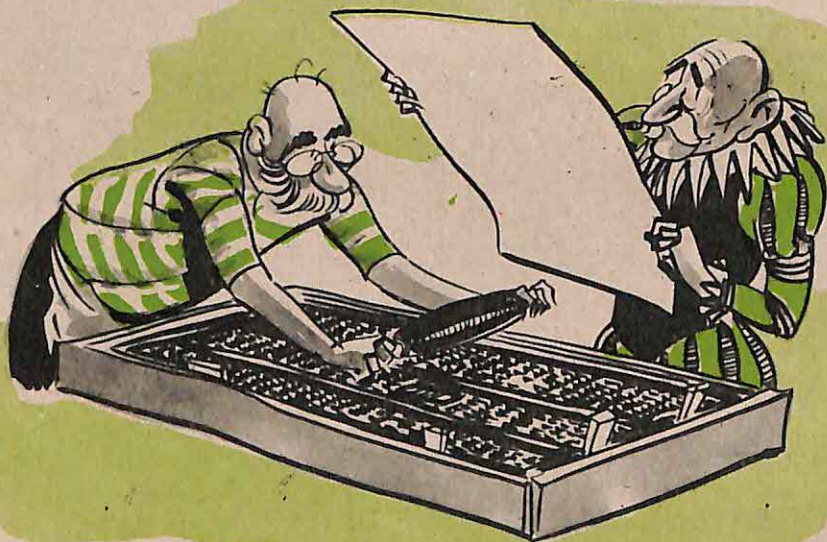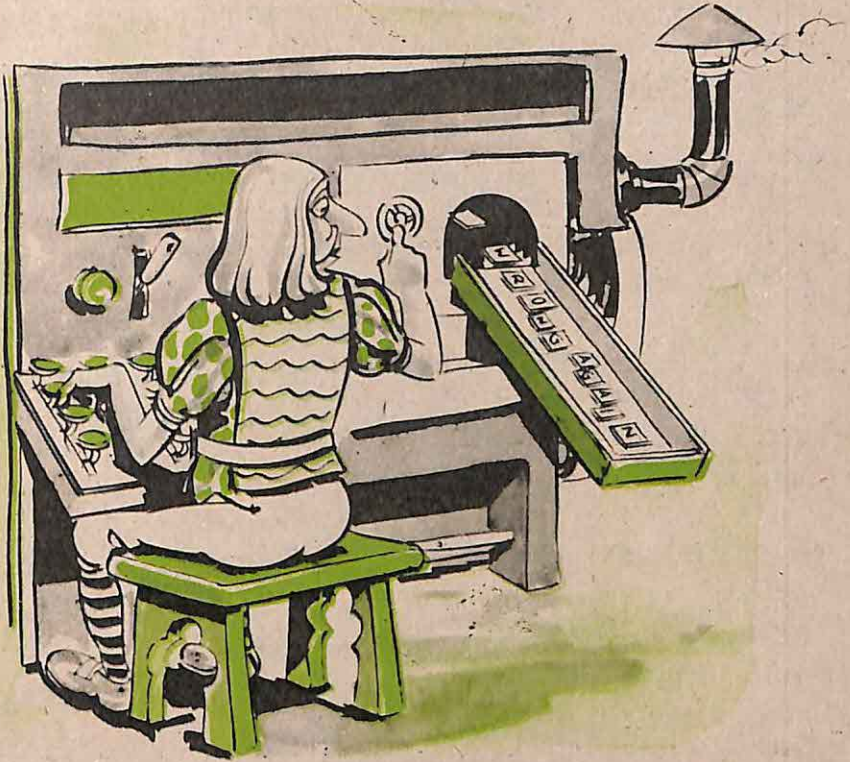
একটি যন্ত্রে ঢোকানো হয়। চাবি টেপার ফলে কাগজের রোলে যে নকশা পড়ে, তার থেকে মুদ্রাক্ষর ঢালাই হয়। ছাঁচ তৈরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুদ্রাক্ষরগুলিকে যথাস্থানে বসানো হয়।

হাতে চালানো মুদ্রণযন্ত্রের সময় থেকে ছাপার পদ্ধতিরও অনেক উন্নতি হল। তার প্রথম পদক্ষেপ, ছাপাখানায় যন্ত্রশক্তির ব্যবহার। অর্থাৎ মানুষ হাতে যে যন্ত্র চালাত এখন সেটা চলতে লাগল শক্তির জোরে। এমনকি ট্রিডল্, যা সেলাই কলের মতো পা দিয়ে প্যাডেল্ করে চালানো হয়, তাও এখন সাধারণত শক্তির সাহায্যে চলে। কিন্তু এই উন্নতি হওয়া

সত্ত্বেও অনেকটা কাজ হাতে সারতে হয়। কাগজগুলি হাতে তুলে খুবই সতর্কতার সঙ্গে ছাপার বেড্ (bed) বা জমির ওপর রাখতে হতো। ছাপার পরে আবার কাগজ বার করে সাজিয়ে রাখার প্রয়োজন ছিল। এসব কোনো কাজই যন্ত্রের সাহায্যে সম্ভব হতো না। ফলে, শক্তি প্রয়োগ সত্ত্বেও ছাপার কাজ তখনও অতটা ত্বরান্বিত করা সম্ভব হয়নি। হাতের কাজের সাথে তাল মিলিয়ে যন্ত্র বেশ ধীরে চলত। অভিজ্ঞ কর্মীরা অন্যদের থেকে তাড়াতাড়ি কাগজের জোগান দিতে পারলেও তাতে ছাপার কাজের গতির দ্রুত উন্নতি সম্ভব ছিল না।

1810 খৃষ্টাব্দে মুদ্রণযন্ত্রে বাষ্পীয়-শক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছিল। তার ফলে তৈরী হল আরো বড় ও ভারী যন্ত্র। এই যন্ত্র হাত দিয়ে যা সম্ভব তার থেকেও বেশী পৃষ্ঠা একসঙ্গে ছাপতে পারে। তাই ছাপার গতি খুব একটা না বাড়লেও, বড় যন্ত্রে একসঙ্গে অনেকগুলি পৃষ্ঠা ছাপানো যেত।

তবে এতে সুবিধা হল সামান্যই। শক্তির পুরো ক্ষমতাকে ব্যবহার করা এখনও সম্ভবপর হচ্ছিল না। আসলে দরকার ছিল একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের (automatic machine), যে যন্ত্র মুদ্রাক্ষরের ওপর কালি লেপবে, কাগজ তুলবে, কাগজকে সঠিকভাবে বসাবে ও তার ওপর ছেপে কাগজটিকে সরিয়ে নেবে এবং ওই পুরো কাজ বারবার করে যেতে পারবে। ক্রমে ক্রমে সবকিছুই সম্ভবপর হল। আজকের দিনে ছোট থেকে বড়, প্রত্যেকটি ছাপাকলই স্বয়ংচালিত। যন্ত্রগুলি কালি লেপে, বায়ু-শোষক পাত্র (air-suction cup) দিয়ে কাগজ তোলে, কাগজকে ছাপার বেডের ওপর রাখে এবং ছাপার পরে সেই বায়ু-শোষক পাত্র দিয়ে কাগজ তুলে নির্দিষ্টস্থানে সাজিয়ে রেখে দেয়।

সংবাদপত্র ছাপার জন্য বড় বড় যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এসব যন্ত্র পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয়। এইগুলিকে বলে রোটারী প্রেস (rotary press) বা ঘূর্ণী ছাপাকল। ঘূর্ণী ছাপাকলে মুদ্রাক্ষরের ছাঁচ একটি ধাতুর পাতখণ্ডের ওপর
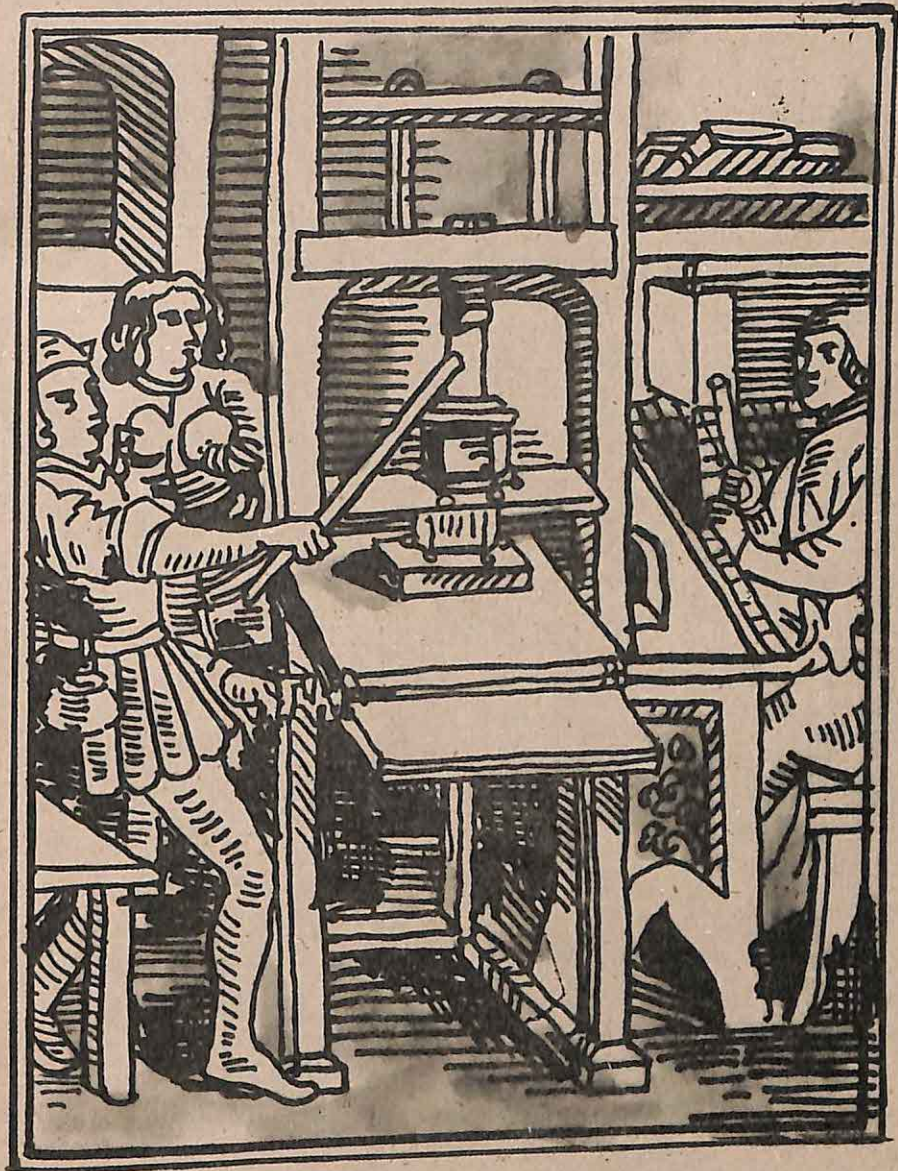
গুটেনবার্গ ছাপাকল

ফেলা হয় এবং ধাতব পাত্রটি একটি গোল সিলিনডারে (cylinder ; চোঙ) মোড়ান হয়। সিলিনডারটি খুব দ্রুত ঘোরে। কাগজ একটি বিশাল রোল থেকে যন্ত্রে ঢুকতে থাকে এবং ছাপার কাজ খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়।

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ব্যবহার করার ফলে ছাপার গতি অনেক বেড়ে গেছে। এই যন্ত্রে এক ঘণ্টার মধ্যে একটি সাধারণ বই-এর 30,000 পৃষ্ঠা অর্থাৎ প্রায় 16পৃষ্ঠা আয়তনের 2,000 কাগজের সিট ছাপতে পারে। ঘূর্ণি ছাপাকলে এক ঘণ্টার মধ্যে 100,000 কপি খবরের কাগজের ছাপা, কাটা ও ভাঁজ করা সম্ভব হতে পারে।

মুদ্রণ সংক্রান্ত অন্যান্য পদ্ধতিগুলিরও আরো অনেক উন্নতি হয়েছে।

বইয়ে, পত্রিকায় ও সংবাদপত্রে অনেক সময়ে ছবি ছাপানো হয়। ছবি ছাপার পদ্ধতি দুরকম; একটি 'লাইন' (line) বা রেখাচিত্র, অন্যটি 'হাফটোন' (half-tone) বা বিভিন্ন আকারের বিন্দু দিয়ে চিত্ররূপায়ণ। লাইন ব্লক দিয়ে পরিষ্কার সাদা-কালো ছবিগুলি ছাপানো হয়। প্রথমে ছবির আলোকচিত্র বিশেষভাবে তৈরী করা দস্তার (zinc) ফলক বা প্লেটের ওপর তোলা হয়। এবার সেই প্লেটটি এ্যাসিডে চোবানো হয়। এর ফলে কালো রেখা ও অন্যান্য ছোটখাটো রেখাগুলি বাদে বাকী জায়গা এ্যাসিডে খেয়ে প্লেটের প্রধান লাইনগুলিকে উঁচু করে দেয়। কালির রোলার ওই নকশা খোদাই করা প্লেটের ওপর চালালে খালি উচু লাইনগুলিতে কালি পড়ে এবং কাগজে পরিষ্কার ছাপ পাওয়া যায়। এই ভাবে প্রস্তুত প্লেটকে লাইন ব্লক বলে।

আলোকচিত্র ও হালকা শেডের (shaded) ছবিগুলি হাফটোন ব্লক দিয়ে ছাপানো হয়। প্রথমে ছবির আলোকচিত্র পর্দার (screen) মধ্যে দিয়ে একটি বিশেষভাবে প্রস্তুত তামার প্লেটের ওপর প্রতিফলিত করা হয়। ফলে, প্লেটের ওপর অনেক ক'টি বিন্দুর সমাবেশে একটি প্যাটার্ণ তৈরী হয় এবং
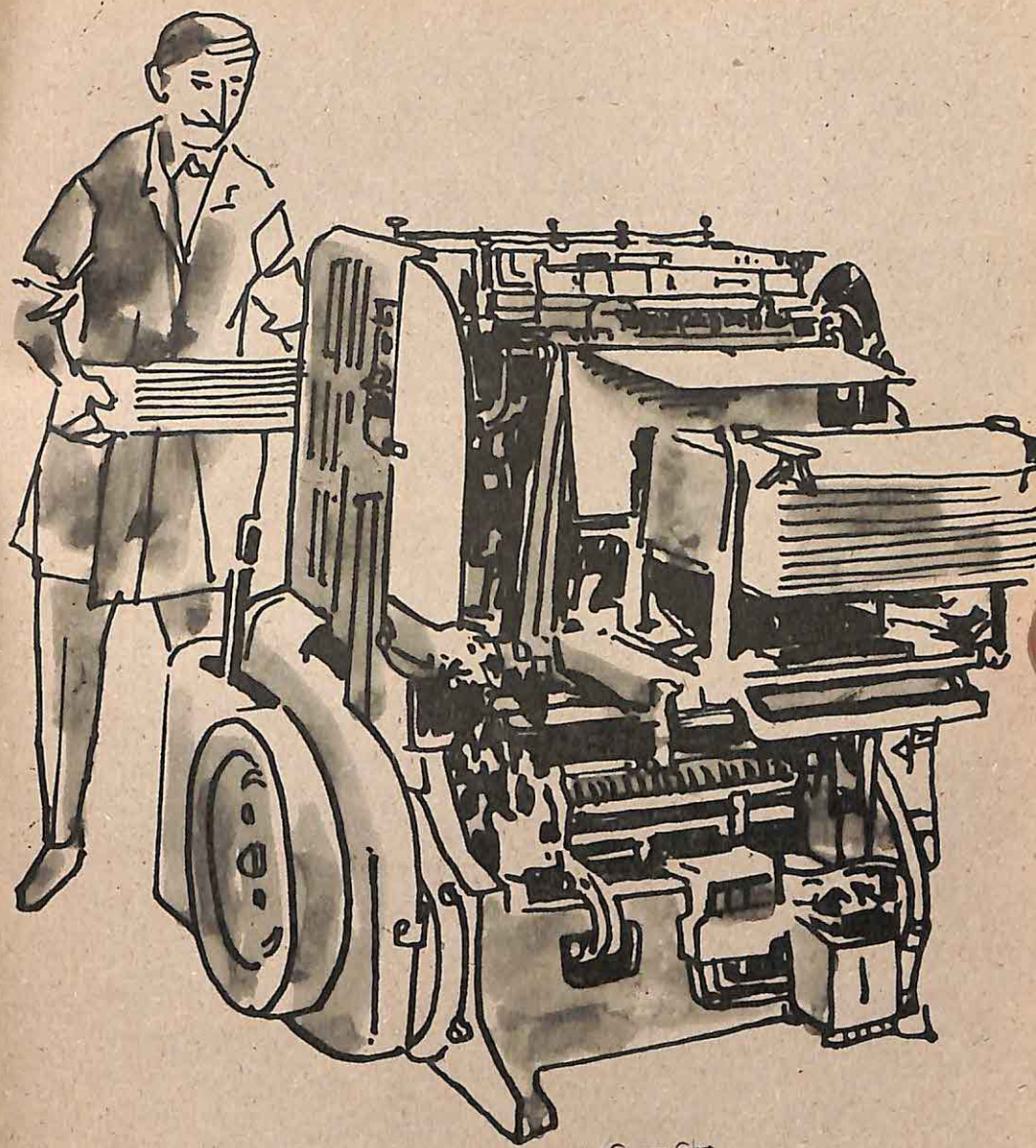
সাধারণ মুদ্রণ যন্ত্র—পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয়

বড় বিন্দুগুলি গাঢ় কালো ক্ষেত্র ও ছোট বিন্দুগুলি হালকা রঙের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে।

উল্লিখিত এই দুই পদ্ধতিতে রঙিন ছবিগুলিও ছাপানো যায়। কোনো এক-রঙা রঙিন প্রলেপ দেওয়া ছবি ছাপতে লাইন ব্লক পদ্ধতি ব্যবহার হয়। ছবির বিভিন্ন রঙ অনুযায়ী ব্লকও সেই ক'টি সংখ্যায় তৈরী হয়। একই কাগজের ওপর প্রতিটি ব্লক দিয়ে পরপর ছাপার পরে মূল ছবির প্রতিরূপ বেরিয়ে আসে। বিজ্ঞাপন, বইয়ের প্রচ্ছদপট এবং অনুরূপ অন্যান্য উদ্দেশ্যে রঙিন ছবি ছাপানোর জন্য লাইন ব্লক পদ্ধতি খুব কাজে লাগে।

যে সব রঙিন আলোক বা অঙ্কিতচিত্রে নানা রঙের সমাবেশ থাকে তা মুদ্রণের জন্য হাফটোন পদ্ধতি ব্যবহার হয়। এই বিশেষ মুদ্রণ পদ্ধতিকে বলা হয় 'তিন রঙের প্রণালী' (three-colour process), কারণ, ছবি ছাপতে ব্যবহার হয় তিনটি মৌলিক রঙ (primary colour)—লাল, হলুদ ও নীল। অন্য যে সব রঙ তোমরা ছবিতে দেখতে পাও তা সবই ওই তিনটি মৌলিক রঙকে ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে মিশিয়ে তৈরী করা যায়। তাই তাদের বলা হয় গৌণ রঙ (secondary colour)।

নানা রঙের সংমিশ্রণ থেকে আলাদা করে তিন রঙের প্লেট বানাতে বিশেষ ধরণের রঙ্গিন ফিলটারের (filter; জল বা তরল পদার্থ পরিস্রুত করার যন্ত্র) সাহায্যে প্লেটগুলি তৈরী হয়। তিনটি প্লেটকে একসঙ্গে বা একটির ওপর আর একটি রেখে ছাপলে মূল চিত্রের রঙিন প্রতিচ্ছবি বেরিয়ে আসে।

'চার-রঙ্গা প্রণালী' (four-colour process) এর থেকে সামান্যই পৃথক। তিন-রঙা প্রণালীর তিনটি প্লেটের সঙ্গে কালো ছাপ দেওয়ার জন্য আর একটি প্লেট যোগ করা হয়। কালো রঙ ছবির ছায়াময় বা কৃষ্ণাভ অংশগুলির গভীরতা আরো ফুটিয়ে তুলতে পারে।

এতক্ষণ যে পদ্ধতিগুলি বর্ণনা করা হল তার প্রত্যেকটিতেই প্লেটের

উঁচু স্তর বা লাইন থেকে ছাপ নেওয়া হয়। প্লেট ও মুদ্রাক্ষরের নীচু জায়গাগুলি অব্যবহৃত থাকে। এছাড়া, আরেকরকম সমতল প্লেট দিয়ে ছাপানোর পদ্ধতি আছে। তার মধ্যে 'লিথোগ্রাফ'ই (lithograph) সবচেয়ে বেশী প্রচলিত।

চুনা পাথরের (limestone) একটি খণ্ডের ওপর থেকে যে নকশার ছাপ নেওয়া হয় তাকে বলে লিথোগ্রাফ। সাধারণত পাথরের খণ্ডের ওপর উল্টো করে ছবি আঁকা হয়, কিম্বা বিশেষভাবে তৈরী কাগজে এঁকে তার থেকে পাথরের ওপর ছাপ তোলা হয়। যে কালি ও রঙিন খড়ি দিয়ে ছবি আঁকা হয় তাতে সাবান ও তেল মেশানো থাকে।

নকশা করা ভিজে চুনা পাথরের ওপর তেলতেলে কালি লেপা হলে ঐ কালি শুধু নকশার খড়ি বা কালি দিয়ে আঁকা লাইনগুলির ওপরে লাগে, বাকী ভিজে জায়গায় কোনো প্রলেপ পড়ে না। এবার পাথরের ওপর কাগজ রেখে চাপ দিয়ে ছাপ তুলে নেওয়া হয়। অনেক সময়ে চুনা পাথরের বদলে বিশেষভাবে প্রস্তুত অ্যালুমিনিয়াম প্লেট ব্যবহার করা হয়। পাথরের ওজন তো খুব ভারী, তাই হালকা ধাতুর প্লেটে ঝামেলা অনেক কম। এছাড়াও ধাতুর প্লেট্ বেশীদিন টিঁকে থাকে বলে বড় ও পরিষ্কার ছাপের অনেক ক'টি প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়।

আলোকচিত্রের প্রয়োগ লিথো ব্যবহারের ক্ষেত্র অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। ফটোলিথোগ্রাফী (photolithography) নামে একধরণের পদ্ধতি এখন প্রচলিত হয়েছে। এতে আলোকচিত্রের নেগেটিভ্‌কে (negative) বিশেষভাবে প্রস্তুত ধাতুর প্লেটের ওপর তুলে নেওয়া হয় এবং তার থেকেই ছাপানো হয়।

সমতল প্লেট্ থেকে ছাপ নেওয়ার আরেক ধরণের পদ্ধতি আছে। একে অফ্‌সেট (offset) বলে। এ পদ্ধতি অনেকটা লিথোগ্রাফের মতো। পাথরের খণ্ড বা ধাতুময় প্লেটের ছাপ রবারের পুরু পাত অথবা চাদরের ওপর তোলা হয়, তার থেকে কাগজে ছাপ নেওয়া যায়।

যন্ত্রবিদ্যার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, অর্থাৎ বিজ্ঞানকে ক্রমশ কাজে লাগাবার ফলে ছাপার পদ্ধতি আরো আধুনিক হয়ে ওঠে। আধুনিক যন্ত্রে মেট্রিক্স্ বা ছাঁচ দিয়ে ধাতব মুদ্রাক্ষর তৈরী হয়। আজকাল একটি নূতন পদ্ধতির খুব চল হয়েছে। একে বলে ফিল্ম-সেটিং (film setting)। এতে ধাতুর সাহায্য ছাড়াই মুদ্রণবস্তুকে আলোকচিত্রের মাধ্যমে সাজানো হয়। এই ধরণের যন্ত্র অনেক ক'টি তৈরী হয়েছে। তার মধ্যে 'লাইনোটাইপ' ও 'মনোটাইপ' ফিল্ম-সেটার (film-setter; ফিল্মের মাধ্যমে মুদ্রাক্ষর সাজানোর যন্ত্রবিশেষ) সবচেয়ে বেশী প্রচলিত। এই দুটি যন্ত্র যেমন আলাদা প্রণালীতে ধাতুর মুদ্রাক্ষর তৈরী করে, ঠিক তেমনি ফিল্ম সাজানোর ক্ষেত্রে এরা আলাদা পদ্ধতিতে কাজ করে।

ফিল্ম-সেটিং প্রণালীতে ধাতব মুদ্রাক্ষরের জায়গায় ফিল্ম ব্যবহার করা হয়। তাই একে বলা হয় 'আলোকচিত্রে মুদ্রাক্ষরবিন্যাস' (photographic composition)। এতে মেট্রিক্স্ ব্যবহার হয়, তবে তা দিয়ে ধাতুর মুদ্রাক্ষর তৈরী হয় না। ফিল্ম তৈরী করার জন্য মেট্রিক্স্ কাজে লাগে এবং ফিল্মগুলি থেকে প্রতিচ্ছবি তুলে নেওয়া হয়।

ফিল্ম-সেটিং পদ্ধতির খুঁটিনাটি এতই জটিল যে তা খুব সহজে বোঝান যায় না। তবে এর ফলে মুদ্রণ পদ্ধতির অনেক উন্নতি হয়েছে আর খরচও কমে গেছে।

মুদ্রণের প্রগতি থেকে টাইপরাইটারের আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। টাইপ-রাইটারের সাহায্যে প্রায় ছ'টি কপি পাওয়া যায় যা ঠিক ছাপানোর মতোই স্পষ্ট। এই যন্ত্র আমাদের এত পরিচিত যে তার বর্ণনার কোনো দরকার করে না। 1867 থেকে 1873 খৃষ্টাব্দের মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে ক্রিস্টফার শোল্স্ (Christopher Sholes) নামে একজন আমেরিকান টাইপরাইটার আবিষ্কার করেন। তিনি অনেকগুলি মডেল (model) তৈরী করেছিলেন। সর্বশেষ মডেলের আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগুলি প্রায় আজকের দিনের টাইপ-রাইটারের মতো।

ডুপ্লিকেটার (duplicator) বা প্রতিলিপি ছাপযন্ত্রের মাধ্যমে আজকাল টাইপ-করা লেখার কয়েক শত প্রতিলিপি পাওয়া সম্ভব হয়। এর জন্য বিশেষভাবে তৈরী মোম-মাখানো ছক-কাটা কাগজ ব্যবহার হয়। এই কাগজের নাম ষ্টেনসিল (stencil)। ষ্টেনসিলের ওপর অক্ষর ছাপলে, তাতে অক্ষর মাফিক ছোট ছোট নকশা তৈরী হয়ে যায়। প্রতিলিপি তোলবার জন্য ষ্টেনসিলকে কাগজের ওপর রেখে তাতে কালির রোলার চালিয়ে ছাপ নেওয়া হয়।

বাস্তবিকই, মুদ্রণের প্রগতি আমাদর সামনে জ্ঞানের দুয়ার খুলে দিয়েছে। পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় কিছু আবিষ্কার হলেই সঙ্গে সঙ্গে তা ছাপা বই বা কাগজের মারফত সর্বসাধরণের কাছে পৌঁছিয়ে যায়। এখন আর বড় বড় মনীষী এবং বৈজ্ঞানিকদের পৃথিবীর কোনো বিচ্ছিন্ন অংশে একা একা হাতড়িয়ে বেড়াতে হয় না। মুদ্রণের সাহায্যে তাঁরা পরস্পরের কাছাকাছি আসতে পেরেছেন। ফলে, তাঁরা জ্ঞান ও চিন্তার বিনিময় করতে পারেন। এক আবিষ্কার থেকে আরেক আবিষ্কার এবং তার ক্রমান্বয়ে মানুষ প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে।